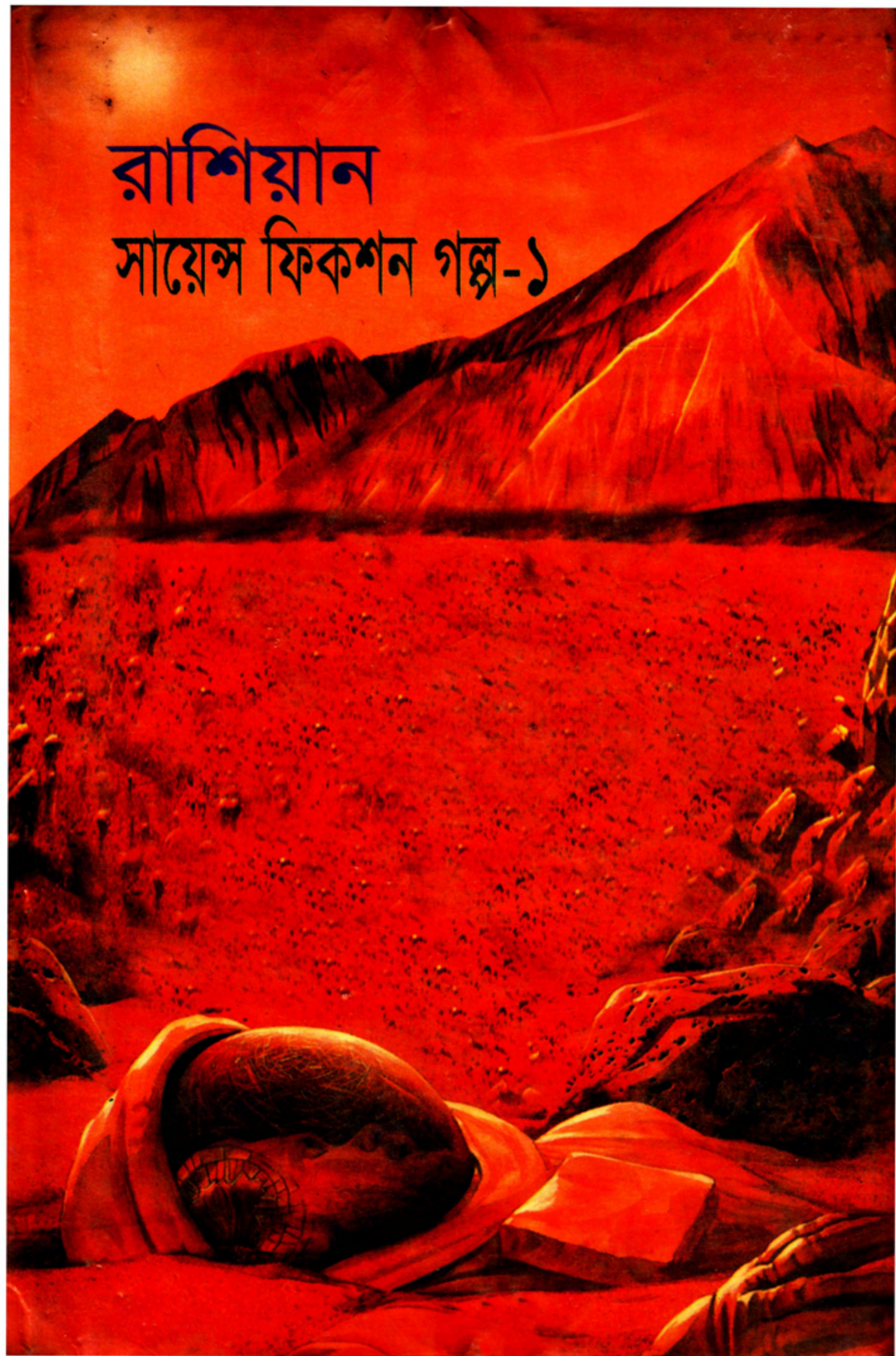

রাশিয়ান
সায়েন্স ফিকশন গল্প-১

রাশিয়ান
সায়েন্স ফিকশন
গল্প-১

সঙ্কলন সম্পাদনা
হাসান খুরশীদ রুমী

ঐতিহ্য

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪০৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রচ্ছদ
বিদেশী চিত্র অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

বর্ণবিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশ টাকা মাত্র

RUSSIAN SCIENCE FICTION GALPA-1 edited by Hasan Khurshid Rumi. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem, Oitijjhya. Date of Publication February 2003.

Website : www.oitijjhya.com
Price : 100.00 US $ 5
ISBN 984-776-180-9

ভূমিকা

পণ্ডিতজনেরা বলে থাকেন, বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হল রাশিয়ান সাহিত্য। বিশ্বের সর্বকালের সেরা সাহিত্যিকদের অনেকেই রাশিয়ান বংশোদ্ভুত। তাঁদের মধ্যে আছেন লিউ টলস্টয়, দস্তয়াভস্কি, আলেকজান্ডার পুশকিন এবং আরো অনেকে। আর রাশিয়ান সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল শাখা হল সায়েন্স ফিকশন। রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান লেখক আইজ্যাক আজিমভকে আমেরিকান লেখকরাই 'গ্র্যান্ডমাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা সায়েন্স ফিকশন বলে স্বীকৃত 'উভচর মানব'-এর স্রষ্টাও রাশিয়ান লেখক– আলেকজান্ডার বেলায়েভ।

আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের তুলনায় রাশিয়ায় সায়েন্স ফিকশনের কদর অনেক বেশি। সেখানে সায়েন্স ফিকশন শুধু মনোরঞ্জক হালকা সাহিত্য হিসেবে কদর পাচ্ছে না, প্রতি বছর প্রকাশিত সায়েন্স ফিকশন বইয়ের সংখ্যা ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশের পাঠকদের রাশিয়ান সাহিত্য বিশেষ করে রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন-এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাংলায় এ ধরনের বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা তাঁদেরকে এই অপূর্ব রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। আমরা সায়েন্স ফিকশন অনুরাগী সেই সব পাঠকদের জন্যে রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশনের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যে সব গল্প সংগ্রহ করেছি তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস এই বই 'রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন গল্প-১'। পাঠকদের ভালো লাগলে ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো বই প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

০১/০২/২০০৩
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

সূচিপত্র

হু উইল বিলিভ ইট?

রোমান পোদোলনি

কাফেটা ছোট আর আরামদায়ক, ঠিক নিজের করতলে গাল রেখে বিশ্রাম নেয়ার মতো।

কিন্তু আমার মুখোমুখি বসা মানুষটার দৃষ্টি ঠাণ্ডা, আমার অর্ডার দেয়া আইসক্রিমটার চেয়েও ঠাণ্ডা। হঠাৎ গাঢ় চোখজোড়া জ্বলে উঠল তার, জানালার পাশের একটা টেবিলের দিকে ইশারা করে সে বলল:

'ওরা দু'জন এখন লড়াই করবে।'

চেয়ার পেছনের ঠেলে উঠে দাঁড়াল দুই যুবক, চেপে ধরল একে অপরের জ্যাকেটের ল্যাপেল।

'এবার আসবে একজন মিলিশিয়াম্যান,' চটপট বলল আমার মুখোমুখি বসা মানুষটা।

একজন মিলিশিয়াম্যান এসে টেনে আলাদা করল লড়াইরত দু'জনকে।

'এবার এই দৃশ্যে আবির্ভূত হবে ওয়েট্রেস।'

আমাদের পাশ দিয়ে গটগট করে ওয়েট্রেস এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

'আর এবার...'

একজন সংবাদিকের মতো বলে চলল সে, আর তার কথা অনুসারে ঘটে চলল ঘটনা।

ব্যাপারটা মজার এবং কিছুটা বিস্ময়কর।

লড়াইয়ের ব্যাপারটা সে বলতে পেরেছে বোধহয় তাদের কিছু কথা শুনে ফেলায়; মিলিশিয়াম্যান যুবক দু'জনকে দেখেছে জানালা দিয়ে; আর ওয়েট্রেস যে বিল নিতে আসবে, এটা বোঝা খুবই সহজ।

'আর এবার,' বলল, 'আমরা পরিচিত হব, তারপর এখান থেকে চলে যাব।'

...পরে যাবার সময় সে বলল, 'আগামীকাল সাতটায় আমাদের দেখা হবে বলশয় থিয়েটারে।'

একমুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'আগামীকাল "ইভনিং মস্কো"-র তৃতীয় পৃষ্ঠায় একটা কবিতার নিচে তুমি আমার ডাকনাম দেখতে পাবে।'

পরদিন সেখানে যেতে যেতে আমি একটা সংবাদপত্র কিনলাম। একটাই মাত্র কবিতা সেখানে। নিচে নাম লেখা-পাভেল বুদকিন। কিন্তু পাভেল কেন? তারা তাকে ডুবিয়েছে। কথা দিয়েও কবিতা ছাপেনি।

'গুড ডে, কমরেড বুদকিন।'

'নাম দেখেছ তাহলে?' বলল সে সোল্লাসে।

'তোমার নাম তাহলে পাভেল, ভিকতর নয়?'

'না, আমার নাম ভিকতরই...কিন্তু আমি কেবল ডাক নামের কথা উল্লেখ করেছিলাম।'

'পাভেল তোমার ভাই?'

'আমি একমাত্র সন্তান। তোমার থেকেই জানলাম যে পাভেল নামের একজন কবি আছে।'

'যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে। মিথ্যে বল না।'

'মিথ্যে তো বলতে চাই, কিন্তু পারি না। আমি যা বলি, তা-ই সত্য হয়ে যায়–একটাই শর্ত, কথাটা কাউকে বিশ্বাস করতে হবে।'

'তাহলে বল দেখি যে এখনই বৃষ্টি নামবে,' বললাম আমি পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে।

'বলতে তো পারি, কিন্তু কথাটা তুমি যে বিশ্বাস করবে না।'

'তাহলে এটা খুবই দরকার যে তোমার কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'তুমি বা অন্য কেউ, তবে তুমি হলেই ভালো।'

'তুমি যে মিথ্যেকথা বলতে পার না, এটা তুমি জানলে কিভাবে?'

'একবার আমার পরিচিত এক মেয়ের কাছে আমি বড়াই করে বলেছিলাম যে অতিরিক্ত কাজ করে যথাসময়ে আমার পরিকল্পনা সফল করব। আমি

জানতাম যে ব্যাপারটা অসম্ভব, কারণ, তখন কাজটার অর্ধেকও হয়নি। হঠাৎ করে একটা গ্যাজেটের কথা মাথায় এল আমার, আর কাজটা হয়ে গেল যথাসময়ে। সেদিনই প্রথম বুঝতে পারলাম, আগামীতে কথা বলার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। একবার কাজে দেরি করে আসার অজুহাত হিসেবে বললাম যে মায়ের অসুখ হয়েছে, একঘন্টা পরেই বাড়ি থেকে এল দুঃসংবাদ... আমার এক বন্ধু বরিসকে রাগাবার জন্যে বললাম যে তার প্রেমিকা ইরিনা আসলে তাকে ভালোবাসে না, পর দিনই আমরা সবাই শুনতে পেলাম, সে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে অন্য এক লোককে বিয়ে করেছে... একবার স্রেফ তর্কাতর্কি করতে করতে বললাম যে পেত্রোসিয়ান পর পর দু'টো গেমে হারবে, পেত্রোসিয়ানকে তার মাশুল গুনতে হল... তার মানে আমি যখনই যা বলেছি, তা কেউ না কেউ বিশ্বাস করছে...'

বই পড়তে লাগলাম আমি। ভিকতরের মতো ঘটনা কি কখনো কোনো মানুষের জীবনেই ঘটেনি? বহু দিন ধরে একটা কথা চালু আছে যে ভালোবাসার জনের অসুখ নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে হয় না, তা হলে সে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা তো কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, নাকি আজো অজানা মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র?

আমার মনে হল, পুরো ব্যাপারটাকে একরাশি কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়ে এই দুঃশ্চিন্তা বাদ দেয়াই ভালো...

ভিকতর ভবিষ্যতের কিছু বলতে শুরু করলেই তাকে থামাবার জন্যে তার মুখে হাত চাপা দিতাম আমি, তারপর হেসে গড়িয়ে পড়তাম দু'জনেই। কিন্তু সবসময় তাকে থামাতে পারতাম না আমি। আর তার ফলে কি হল?

জন্মদিনে আমি পেয়ে গেলাম অত্যন্ত দুর্লভ একটা বই, সমস্ত পরীক্ষায় পেলাম সর্বোচ্চ নম্বর, তার মা আমাকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলল। আমি... কিন্তু সবসময় কেবল আমার কথাই বলা কি ঠিক?

দাবায় স্মাইস্লভকে পর্যন্ত হারিয়ে দিল ভিকতর, কারখানার দাবা প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল সে। তার পাঁচটা আবিষ্কার গ্রহণ করল কারখানা, পেল সে তিনটে বোনাস, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উত্তোলন করল ১২৫ কিলোগ্রাম, এমনকি লিখে ফেলল একটা কবিতা।

কবিতার লাইনগুলো নিম্নরূপ:

এক নিশ্বাসে চূর্ণ করব পাহাড়,
গ্রহও সয় না ধাক্কা আমার।
যে-মানুষে বিশ্বাস রয়েছে তোমার
অসাধ্য কিছুই নেই যে তার।

চমৎকার একজন মানুষ ছিল সে, ভারি চমৎকার মানুষ, যে কখনোই মিথ্যে বলতে পারত না। সম্ভবত আরো কবিতা রচনা করেছিল সে। আমি জানি না, কারণ, ঠিক তখনই এক অভিযান শেষে ফিরে এসেছিল ইগর। একদিন ভিকতরের সঙ্গে পথে দেখা হল আমাদের। এগিয়ে এসে আমাদের দু'জনকে ভালোভাবে দেখে সে বলল, 'তোমরা একে অপরকে ভালোবাস।' তারপরেই চলে গেল। তার সঙ্গে আর কোনো দিনই দেখা হয়নি আমার। কিন্তু কথা মনে আছে আমার খুব। কারণ, এখন আমি ভারি সুখী। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনারা, ভিকতর কখনই মিথ্যে বলেনি।

অনুবাদঃ খসরু চৌধুরী

ইনভিজিবল নাইট

আলেকজান্ডার বেলায়েভ

'পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ভাইরোভাল একজন জনপ্রিয় ডাক্তার।'

'অবশ্যই, বিশেষ করে একজন অন্ধ লোকও সেটা দেখতে পাচ্ছে।'

'আপনি কি করে বুঝলেন যে আমি অন্ধ?'

'আপনার অমন পরিষ্কার নীল চোখগুলোও আমাকে ধোঁকা দিতে পারেনি। কেননা ওগুলো একদম স্থির, ঠিক যেন পুতুলের চোখ।' তারপর সামান্য একটু হেসে উঠে লোকটা আমায় বলেন, 'আর তাছাড়া, আমি একটু আগে আপনার ঠিক নাকের ডগায় আঙ্গুল নাচিয়ে দেখেছি, একবার চোখের পলকটাও ফেলেননি।'

'বেশ ভালোই বুদ্ধি,' অন্ধ লোকটা একটা তিক্ততার হাসি সহ বলে, তারপর হাত দিয়ে তার পরিপাটি বাদমী রংয়ের চুলগুলো আরেকটু গুছিয়ে নেয়। 'হ্যাঁ, আমি অন্ধ। আর আমি যখন বলেছিলাম যে "দেখা যাচ্ছে" ওটা আসলে অভ্যেসবশে বলে ফেলা একটা কথা। তবে খ্যাতি আর বৈভব বোঝার জন্য কারো চোখ থাকাটাও খুব জরুরী না। এই জায়গাটা শহরের সেরা অঞ্চলে অবস্থিত, পুরো বাড়িটাই ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে বানান। ফটকের কাছে গোলাপের গন্ধ, চওড়া সিঁড়ি, দরজায় দারোয়ান, পুরো হল রুমে ভেসে বেড়াচ্ছে দামী সুগন্ধি। সেক্রেটারী, চাকর, পরিচালিকা, প্রতিবার সাক্ষাতের জন্য মোটা ফি, এবং সহকারী দিয়ে রোগীদের প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা। পায়ের নিচে নরম কার্পেট, আসনে সিল্কে মোড়া গদি। সব মিলিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে পুরো ঘরটার জন্য যথেষ্ঠ খরচ করা হয়েছে।'

'হুম্ বলতে হবে একটা সযত্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি,' অপর লোকটা নিচু গলায় মন্তব্য করে, ঠোঁটের ওপর একটা শ্লেষপূর্ণ হাসি খেলা করে তার ফ্যাকাশে মুখটাতে ভাঁজ ফেলে যায়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ভাইরোভালের অভ্যর্থনা কক্ষটাকে ভালো করে দেখে, যেন অন্ধ লোকটার পর্যবেক্ষণ বিষয়েই নিশ্চিত হয়ে নেয়। ঘরের প্রতিটা হাতলঅলা চেয়ারই অপেক্ষমান রুগীতে পূর্ণ, যাদের প্রায় প্রত্যেকের চোখে হয় রঙ্গিন চশমা নয়তো ব্যন্ডেজ। প্রতিটা মুখে লেপ্টে রয়েছে একই সাথে প্রত্যাশা, দুশ্চিন্তা আর আশার আলো।

'দেখা যাচ্ছে যে আপনি তো খুব বেশি দিন হয়নি আপনার দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছেন। তা ব্যাপারটা হল কি ভাবে?' তিনি আবার অন্ধ লোকটাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

'কিসের থেকে আপনার এমনটা মনে হল?' অন্ধ লোকটা অবাক হয়ে তার ভ্রু দুটো উঁচিয়ে জানতে চায়।

'মনে হল, কেননা যারা জন্মান্ধ তারা এই ব্যাপারটায় একটু অন্যভাবে রিএ্যাক্ট করে। খুব সম্ভবত আপনার অপটিক নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আমি একজন ইলেকট্রিশিয়ান। আগে কাজ করতাম ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিসিটি কোম্পানীতে, তাদের এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাবে। একটা নতুন ধরনের আল্ট্রা ভায়োলেট বাতির ওপর...'

'এইবার বোঝা গেল, আমিও মনে মনে এমন কিছু একটা কথাই ভাবছিলাম, ভালো।' লোকটা তার দুই হাত ঘসতে ঘসতে মাথাটা অন্ধ লোকটার দিকে কাত করে ফিশ ফিশ করে বলে:

'আপনি বরং এই হাতুড়ে বদ্যি ভাইরোভালের আশা ছেড়ে দিন না কেন? আপনি ওর কাছ থেকে পাড়ার মোড়ের মুচির চেয়ে বেশি কিছু পাবেন বলে মনে হয় না। ভাইরোভাল আপনাকে ঠিক ততদিনই আশার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখবে যতদিন না সে আপনার পকেটের শেষ ফুটো কড়িটাও হাতিয়ে নিতে না পারছে। তারপর সে আপনাকে জানাবে যে সে যত রকমে সম্ভব সব চেষ্টা করে দেখেছে আর কেউ এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। এবং তার সেই কথাটা সত্যিও হবে বটে, কেননা তখন আর কোনো বিশেষজ্ঞেরই আপনার কাছ থেকে একটা পয়সাও বের করার অবস্থা থাকবে না। আচ্ছা, আপনার কি মেলা টাকা পয়সা আছে নাকি? আপনি চলছেন কিভাবে?'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে বড় ধরনের বেকুব ঠাওরেছেন?' অন্ধ লোকটা বিরক্তিভরে বলে। 'কিন্তু একটা অন্ধও তো দেখতে পাচ্ছে যে আপনি অপর কোনো ডাক্তারের হয়ে দালালী করতে এসেছেন।'

'আরে যা! আপনি দেখছি ধরে ফেললেন,' লোকটা হেসে ওঠে।

'আমি সত্যিই দালালী করছিলাম। আমার নাম ক্রুস।'

'আর সেই ডাক্তারটার নাম?'

'তাও ক্রুস।'

'দু'জনের একই নাম!'

'না তারচেয়েও বেশি, মানে দু'জনে একই লোক,' কথাটা বলতে বলতে ক্রুস ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করে। 'আমি আমার নিজের জন্য দালালী করছি। ডা. ক্রুস আপনার সেবায় হাজির। আমি কি আপনার নামটা জানতে পারি?'

এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ লোকটা চুপ করে থাকে তারপর নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে বলে-

'ডব্বেল।'

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ মি. ডব্বেল এই মুহূর্তে আপনি আমার সম্বন্ধে ঠিক কথাটা ভাবছেন তা আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ব্যবসাদারদের এই শহরে যেখানে সবাই যে যার মতো করে খাবার চেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে ডাক্তাররাও একে অন্যের রোগী ভাগিয়ে নেবার জন্য যত রকমের নোংরামী আছে করে চলেছে আর সেটা করতে গিয়ে কখনো কখনো প্রতারণার সাহায্যও নিচ্ছে। তবে তারপরেও কিন্তু এমন ডাক্তারের সংখ্যা খুব একটা বেশি হবে না, যে নাকি অন্য ডাক্তারের ওয়েটিং রুমে বসে নিজের পক্ষে দালালী করার মতো মর্যাদাহানিকর একটা কাজ করতে রাজি হবে। সত্যি কথাটা স্বীকার করুন মি. ডব্বেল, আপনি আমার সম্বন্ধে ঠিক অমনটাই ভাবছিলেন কিনা?'

'ধরুন যদি তাই ভেবে থাকি, তাতে কি আপত্তির কিছু আছে?'

'না তা যদি হয়ে থাকে তবে আমাকে এটা বলতেই হবে মি. ডব্বেল যে আপনি ভুল করছেন।'

'আপনার এই কথাটাতেও আমার মনোভাবে তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না।' জবাব দেয় অন্ধ লোকটা।

'সে প্রসঙ্গে আমি বলব যে একটু অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে।' ডাক্তার বেশ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অথচ নিচু গলাতেই কথাটা বলেন। 'আমরা বরং অপেক্ষা করি আর দেখি না কি হয়। আমার তরফ থেকে দেবার মতো বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে যেগুলো মনে হয় না যে আপনি খণ্ডাতে পারবেন। দেখুন, আমি আসলে একজন বিশেষ ধরনের ডাক্তার। চিকিৎসা শুরু করার জন্য আমি কোনো ফি চার্জ করি না। তারচেয়েও বড় কথা হলো আমি আমার রোগীদের চলার জন্য উল্টো পয়সা দেই।'

অন্ধ লোকটার চোখ চিক্ চিক্ করে ওঠে।

'তবে কি কোনো দাতব্য প্রতিষ্টান?' সে বেশ নিচু গলায় জানতে চায়।

'না, ঠিক তা বলা যাবে না,' ক্রুস জবাব দেন। 'দেখুন, আমি আপনার সাথে খোলাখুলিই আলাপ করব মি. ডব্বেল, এবং আমি আশা করি যে তখন আপনি আপনার মন্তব্য ফেরত নেবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার ডাক আসবে কাজেই আমি বরং সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করি। আমার বাবা মা আমার জন্য যথেষ্ঠ ধন-সম্পদ রেখে গেছেন, যার জোরেই আমি নিজস্ব গবেষণা চালানোর মতো বিলাসিতাটুকু করতে পারি। আমার নিজের বাড়িতেই একটা ছোট্ট ক্লিনিক রয়েছে, সেই সাথে খুব উন্নত যন্ত্রপাতিতে সাজান একটা ল্যাবরেটরিও। এবং আপনার কেসটা নিয়ে আমার আগ্রহ রয়েছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু আপনি আসলে আমাকে বলতে চাচ্ছেনটা কি?' ডব্বেল এবার একটু অস্থির গলাতেই বলে কথাটা।

'এই মুহূর্তে কিছুই না', ক্রুস জবাব দেয়। 'আমার সময় আসবে তখন যখন নাকি ভাইরোভাল আপনার শেষ কপর্দকটাও হাতিয়ে নিয়ে যাবে। আমি এখন আসলে যেটা জানতে চাই, তা হলো যে আপনার কাছে ঠিক কি পরিমান জমা টাকা পয়সা রয়েছে। আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন যে আপনার টাকা পয়সার ওপর আমার কোনো লোভ নেই।'

'সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছে খুব বেশি কিছু নেই,' ডব্বেল একটু কুণ্ঠার সাথেই জানাল। 'আমার এই দুর্ঘটনার খবরটা লোকে জেনে গিয়েছিল, সে সময় পত্র পত্রিকাতেও এটা নিয়ে কিছু লেখালিখি হয়েছিল। কাজেই কাজেই আমার কোম্পানী অনেকটা চাপে পড়েই আমাকে একটা ভালো অংকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছিল, ভালো বলতে প্রায় বছর খানেক চলার মতো। এটা একটা সৌভাগ্যই বলতে পারেন কেননা যে দিনকাল পড়েছে তাতে কোনো সুস্থ লোকও এখন অতদিনের জন্য নিশ্চিত হতে পারে না।'

'হ্যাঁ বুঝলাম, কিন্তু এখন? এখন আপনার কাছে যা আছে তা দিয়ে আর কত দিন চলতে পারবেন বলে মনে করছেন?'

'তা প্রায় মাস চারেক।'

'আর তারপর?'

ডব্বেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করে।

'ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকাটা আমার অভ্যেস নয়,' তিনি বলেন।

'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন,' ক্রুস মেনে নেয়। 'ইদানিং যা দিনকাল পড়েছে তাতে ভালো চোখের লোকেরাও ভবিষ্যত খুব একটা ভালো দেখতে পায় না। যাক গিয়ে, চার মাস বলছেন, হুম। ভালো, আমি আশা করি যে ডা. ভাইরোভাল ঐ সময়টাকেই ছেঁটে আরেকটু ছোট করে দিতে পারবে। তো তারপর আপনার কাছে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার মতো বা বেঁচে থাকার মতো আর কোনো টাকা পয়সাই থাকবে না। চমৎকার, বেশ, তখন আপনি আমার কাছে চলে আসেন না কেন?'

কিন্তু ততক্ষণে নার্সটা হাঁক দিয়েছে : 'আটচল্লিশ নাম্বার' এবং ডব্বেল আর জবার দেবার মতো সময় পায় না।

সে উঠে দাঁড়ায় এবং শক্ত টুপি মাথার নার্স এগিয়ে এসে ডব্বেলের হাত ধরে কন্সালটিং রুমের দিকে টেনে নিয়ে যায়, ক্রুস তখন অলস ভাবে সামনের চকচকে টেবিলটাতে রাখা একটা পত্রিকা তুলে নেন।

অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডব্বেল আবার ফিরে আসেন, তাকে খুব খুশি আর উত্তেজিত লাগছিল। ক্রুস এগিয়ে আবার তার সাথে যোগ দেন।

'আমি কি আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি? তা কেমন হল ভিতরে?' তিনি জানতে চান। 'এটা তো নিশ্চিত যে ভাইরোভাল আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, নাকি?'

'হ্যাঁ অবশ্যই!' ডব্বেল জবাব দেয়।

'সেটা যে সে নিশ্চয়ই করবে তা আর বলার অপেক্ষা নেই,' ক্রুস কুলকুল করে হাসতে হাসতে বলে। 'এবং তার সাহায্যে আপনি নিশ্চিত আবার দেখতে পাবেন। কিছু না কিছু তো অবশ্যই দেখবেন। আপনি জানতে চাইছিলেন যে আমি আপনাকে কিসের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। সেটা আসলে আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। সম্ভবত ভবিষ্যতে আমি আমার সর্বস্ব আপনার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যয় করব। কিন্তু প্রথমে আপনাকে আমার জন্য কিছু করতে হবে... না না ভয় পাবার কিছু নেই। ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট মাত্র। যার ফলে যাই ঘটুক না কেন আপনি অন্তত আর অন্ধের আঁধারে থাকবেন না।'

'আমি আপনাকে ঠিক মতো বুঝতে পারছি না। আপনি বলছেন যে আমি আবার আলো এবং আঁধারের পার্থক্য করতে পারব? কিন্তু ভাইরোভাল তো আমাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

'ওহ্ হো, আমি জানি যে আমি সময়ের আগেই অনেক কথা বলে ফেলি, তবে হ্যাঁ এটা নিশ্চিত যে আমার সময়ও আসবে।'

তারা যখন ডব্বেল যেখানে থাকে সেই লজটার কাছে পৌঁছালেন তখন ক্রুস বললেন:

'তো এখন আমি জানলাম যে আপনি কোথায় থাকেন। এই আমার কার্ড। এতে আমার ঠিকানা দেয়া আছে। আমি তিন মাস সময়ের মধ্যেই আপনার দেখা পাবার আশা করছি।'

'আমিও আপনার সাথে দেখা করার আশা করছি, আমার নিজের চোখে আপনাকে একবার দেখার জন্য। আর কিছু না হোক অন্তত কেবল এটুকু আপনার কাছে প্রমাণ দেবার জন্য যে ডা. ভাইরোভাল কোনো...'

'কোনো হাতুড়ে বৈদ্যি না বরং অলৌকিক শক্তিধারী', ক্রুস তার গাড়ির দরজাটা লাগাতে লাগাতে হা হা করে হেসে ওঠে। 'বেশ অপেক্ষা করেই দেখা যাক তবে।'

আর একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে অন্ধ লোকটা ফুটপাথ পার হয়ে বাড়িটার ভিতরে চলে যান।

শেষ বারের মতো ডব্বেল গদিওয়ালা ট্যাক্সিটাতে চড়ে বসে। তার পকেটে কেবল ট্যাক্সির ভাড়াটুকু মেটানোর মতো পয়সা পড়ে আছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজনের শব্দ ট্রামের টুং টাং আওয়াজ মিলিয়ে যেতে থাকে এবং তিনি তার চামড়ার ওপর রোদের উষ্ণতা টের পান। এখানে, এই শান্ত রাস্তাটার ওপর কোনো উঁচু দালানের ছায়া পড়ে রোদটা ঢাকা পড়ছে না।সতেজ গাছ পালা আর টাটকা মাটির গন্ধ ভেসে এসে নাকে লাগে, এবং ডব্বেল বেশ বুঝতে পারেন চারপাশের বাড়িগুলোতে সব বারান্দা কিম্বা বাগান রয়েছে। এসফল্টের ওপর দিয়ে মাঝে মধ্যে ছুটে যাওয়া একটা দুটো গাড়ির শব্দ ছাড়া চারপাশের বাড়িগুলোতে সব বারান্দা কিম্বা বাগান রয়েছে। এসফল্টের ওপর দিয়ে মাঝে মধ্যে ছুটে যাওয়া একটা দুটো গাড়ির শব্দ ছাড়া চারপাশে আর সবকিছুই বেশ ছিমছাম, সেই গাড়িগুলোও সম্ভবত এই সব বাড়ির মালিকদেরই হবে। ক্রুস যদি এই এলাকাতে বাস করে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই যথেষ্ট ধনী।

ড্রাইভার তার ব্রেকটা চেপে ধরে গাড়িটাকে থামিয়ে দেয়।

'আমরা কি পৌঁছে গেছি?' ডব্বেল জানতে চায়।

'হ্যাঁ আমরা এসে গেছি, চলুন আমি আপনাকে ওপরে বাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

এক ঝলক ফুলের সুবাস, পায়ের নিচে বালির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ...

'একটু সাবধানে এখানে সিঁড়ি রয়েছে।'

'ধন্যবাদ বাকিটা আমি একাই যেতে পারব।' ডব্বেল ড্রাইভারের ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে। সে দরজা খুলতে গিয়ে দেখে সেটা খোলাই রয়েছে। ঘরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা।

'আপনি ডা. ক্রুসের সাথে দেখা করতে এসেছেন?' কণ্ঠস্বরটা একজন মহিলার।

'হ্যাঁ, আপনি কি দয়া করে তাঁকে বলবেন যে ডব্বেল এসেছে? তাঁকে এটা বললেই তিনি চিনবেন।'

একটা ছোট্ট উষ্ণ হাত এগিয়ে এসে ডব্বেলকে স্পর্শ করে।

'আমি আপনাকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে যাচ্ছি চলুন।'

বাতাসের গন্ধ কিছুটা পাল্টে যায়, পরিবর্তনটা খুবই সামান্য তবু টের পাওয়া যায়। দেয়ালগুলো থেকে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে এবং ঘরের ভিতরটা উষ্ণতা আর শীতলতার একটা চমৎকার মিশেল। ডব্বেল আন্দাজ করেন তার গাইড তাকে ছোট বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটা ঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোনোটায় প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে, কোনোটায় বা ভারি পর্দা টানা, কোনো ঘর হয়তো আসবাবপত্রে ঠাঁসা আবার কোনোটা একেবারেই ফাঁকা। আশ্চর্য একটা বাড়ি। আর আগন্তুক তখনো রোগীকে অনেকগুলো ঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলেছে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে একটা দরজা খুলে যেতেই তিনি ক্রুসের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পান:

'আরে, আরে! এটা কাকে দেখছি? ধন্যবাদ আইরিন, তুমি এবার আসতে পার।'

কোমল উষ্ণ হাতটার জায়গায় চলে আসে ক্রুসের শীতল শুষ্ক হাতটা। আর মাত্র কয়েক পা যেতেই একটা কড়া হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ ভেসে আসে সেই সাথে গ্লাস পোরসিলিন আর স্টিলে টুং টাং শব্দ, যেন কেউ ডাক্তারী যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করছে।

'তাহলে মি. ডব্বেল শেষ পর্যন্ত আপনি আমার ডেরায় এলেন।' উচ্ছল গলাতেই বলে ক্রুস। 'আসুন এই হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে আরাম করে বসুন। আপনার সাথে আমার যে শেষ দেখাটা হয়েছিল সেটা কতদিন আগে? দুই মাস, তাই না? অবশ্য যদি আমার হিসাবে কোনো ভুল না হয়ে থাকে। হুমম্ তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার বন্ধু ডা. ভাইরোভাল আমি যেমনটা ভবিষ্যতবাণী করেছিলাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি আপনাকে ফাঁকা করে ফেলেছে। তো, আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? নাহ্ এই কথাটা আসলে আমার জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হয়নি।'

ডব্বেল তার মাথাটা নিচু করে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে ওল্ড চ্যাপ আপনাকে আর মাথা হেঁট করে থাকতে হবে না।' ক্রুস সশব্দে হাসতে হাসতে বলে। 'এখানে আসার জন্য আপনাকে কখনো আপসোস করতে হবে না।'

'আপনি আমার কাছ থেকে চাচ্ছেনটা কি?' ডাব্বেল জানতে চায়।

'আপনাকে যা বলার আমি একেবারে খোলাখুলিই বলব,' ক্রুস বলে। 'আমি আসলে আপনার কেসটার মতো একটা কেসই খুঁজছিলাম। আর হ্যাঁ, আমি বিনে পয়সায় আনন্দের সাথে আপনার চিকিৎসা করব, এমনকি আপনার চলার মতো ব্যবস্থাও করব। এবং চুক্তির নির্ধারিত সময়ের পর আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য আমার সাধ্যের সবটুকুই করব।'

'চুক্তির নির্ধারিত সময়! কিসের চুক্তি?' ডব্বেল খানিকটা বিভ্রান্তের মতোই জানতে চায়।

'আমাদের মধ্যে তো অবশ্যই একটা লিখিত চুক্তি থাকতে হবে,' ক্রুস হেসে ওঠে। 'এটা তো পরিষ্কার যে এই পুরো ব্যাপারটা থেকে আমারও কিছু ফায়দা চাই। আমি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি এখন সেটার নিয়ন্ত্রণ তো আমার হাতে থাকা চাই। আমি আপনার ওপর অস্ত্রোপচার করতে চাই। অবশ্যই সেখানে আপনার জন্য কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে। যদি সব কিছু ঠিক মতো হয় তবু আপনি কিন্তু অন্ধই থেকে যাবেন। তখন আপনি সেই সব জিনিস দেখতে পাবেন না পৃথিবীর কোনো মানুষই এর আগে কখনো দেখেনি। তারপর যখন আমার এই আবিষ্কারটার পেটেন্ট নেয়া হয়ে যাবে তখন আমি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য মানুষের সাধ্যে কুলায় এমন সবকিছুই করব।'

'এবং আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই চুক্তিতে রাজি হওয়া ছাড়া আমার সামনে আর কোনো পথই খোলা নেই?'

'একদম খাঁটি কথা মি. ডব্বেল। নাহলে এখান থেকে বেরিয়ে আপনি যাবেনটা কোথায়? ভিক্ষের থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন?'

'বেশ অন্তত এটুকু বলুন যে অপারেশন করার পর আমার অবস্থা কি হবে?' অন্ধ লোকটা খানিকটা রাগের ছোঁয়া সহই বলে কথাটা।

'যদি এক্সপেরিমেন্টটা সফল হয়ে যায় তাহলে আপনি, আমি নিশ্চিত যে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট, ম্যাগানেটিক ফিল্ড এবং রেডিও ওয়েভ এসব দেখতে পাবেন। অন্য ভাবে বললে বলা যায় যে আপনি ইলেক্ট্রনের নড়াচড়া দেখতে পাবেন। যদিও ব্যাপারটা খুব সাধারণ তবু শুনতে চরম অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।' ঘরের ভিতর পায়চারি করতে করতে ক্রুস এরপরে একেবারে লেকচার দেবার মতো করে তার বক্তব্য বলে যেতে থাকে:

'আপনি নিশ্চয় জানেন যে আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয় বাইরের বিভিন্ন রকমের উদ্দীপনায় আলাদা আলাদা ভাবে সাড়া দেয়। আপনার কানের ওপর হাল্কা করে আঘাত করলে আপনি এক ধরনের গুঞ্জনের শব্দ শুনতে পাবেন। আপনার চোখের বলটাতে আঘাত করার পর চোখটাকে আস্তে করে চেপে রাখলে আপনি আলো অনুভব করতে পারবেন—চোখের সামনে তারা জ্বলতে থাকবে। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে দেখার ইন্দ্রিয় কেবল যে আলোক সংবেদন তাই না বরং তা মেকানিক্যাল, থার্মাল এবং বৈদ্যুতিক উদ্দীপনাতেও সাড়া দেয়। আমি একটা ছোট খাটো যন্ত্র বানিয়েছি, একটা ইলেক্ট্রনোস্কোপ, অনেকটা গ্যালভানোস্কেপের মতোই তবে প্রচণ্ড সূক্ষ্ম ক্ষমতার। যেটার তারগুলো (যেগুলো সব রূপার তৈরি এবং প্রায় আনুবীক্ষণিক) চাইলে অপটিক নার্ভ এমন কি ব্রেনের সেন্টার অভ ভিশনের সাথেও জুড়ে দেয়া সম্ভব। ইলেক্ট্রনোস্কোপের যে কারেন্টের উপস্থিতি ধরা পড়বে তা ব্রেনে গিয়ে দৃশ্য বদলে যাবে। সোজা কথায় এটুকুই বলা যায়।'

'এই কাজে মূল সমস্যাটা হল ইলেক্ট্রনোস্কোপের মতো একটা জড় বস্তুকে জীবন্ত শরীরের সাথে ঠিক মতো জুড়ে দিয়ে তার থেকে আপনার বাইফোকাল মেকানিজমের পুরোপুরি ফায়দা নেয়া এবং শূন্য স্থানে আলোর অনুভূতি নিয়ে আসা। সম্ভবনা রয়েছে যে আপনার অপটিক নার্ভের অংশ বিশেষ এখনো ভালোই আছে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। সেখানেও একটা সমস্যা থাকবে যে যন্ত্রটা ব্রেনের সাথে জুড়ে দেবার জন্য ওর মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো অংশটুকু বাছাই করে নেয়া। তবে সেটা নির্ণয় করার আগে কোনো অবস্থাতেই আমরা আপনার অপারেশনে যাব না। পাশে ধারের নার্ভ, মাসল অথবা ব্লাড

ভেসেলের সাহায্যেও এটা পাওয়া সম্ভব। মানে কিনা বিশাল একটা কর্মকাণ্ড, এখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবার আগে না হয় আর বিশদ কিছু বললাম না।'

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি', ডব্বেল বলেন। 'চলুন ব্যাপারটার সামনা সামনি হওয়া যাক। এখন যা অবস্থা তাতে তো আমার অন্তত এখানে হারানর মতো কিছু নেই। এক্সপেরিমেন্টটা চালান যাক। আপনি প্রয়োজন মনে করলে আমার পুরো মাথাটাই ঘেঁটে দেখতে পারেন।'

'ভালো, অতি চমৎকার। এখন অন্তত দেখা যাচ্ছে যে আপনার জীবনের একটা লক্ষ্য রয়েছে। সেই জিনিস দেখার আকাঙ্খা যা নাকি দুনিয়ার কোনো মানুষ কখনো দেখেনি। সবার জীবনে এমন সুযোগ আসে না।'

'আপনি নিজের জন্যও একটা বিশাল সুযোগ পাচ্ছেন,' বিদ্রুপের গলাতেই বলে ডব্বেল।

'এখন একটা জবরদস্ত বিজ্ঞাপন ছাড়তে পারলেই ভাইরোভালের রোগী সব সুড় সুড় করে চলে আসবে,' হাসতে হাসতেই প্রত্যুত্তর করে ক্রুস।

'অন্ধকার, কয়লার মতো কালো অন্ধকার। এবং অতলের মতো গভীর। না, আমি মিথ্যে বললাম। এই অন্ধকারের সাথে তুলনা করার মতো আসলে কিছুই নেই। আমি জানি না আমার চোখের সামনে হাজার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত অন্ধকার রয়েছে নাকি কয়েক সেন্টিমিটারের আঁধার। আমি কি কোনো শূন্যস্থানের মাঝে রয়েছি নাকি আমার চারপাশে নানা রকমের জিনিস রয়েছে আমি জানি না। কেননা যতক্ষণ না আমি স্পর্শ করে কিছু পাচ্ছি বা কিছু এসে আমাকে আঘাত করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বস্তুর অস্তিত্বই আমি টের পাচ্ছি না।'

ডাব্বেল নিশ্চুপ হয়ে যায়।

তিনি একটা বড় সাদা ঘরের মাঝে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তার চোখ এবং মাথা ব্যান্ডেজে মোড়া ছিল। ক্রুস তার পাশেই একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন।

'ডাক্তার আমাকে বলুন তো আপনি অত জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন কেন?' ডাব্বেল জানতে চায়।

'আমি সত্যিই জানি না, মনে হয় প্রবল উত্তেজনার কারণে আমার হৃদপিণ্ড আমার সাথে খেলা শুরু করেছে। হ্যাঁ আমি উত্তেজিত মি. ডব্বেল, এমনকি মনে হয় আপনার চাইতেও বেশি উত্তেজিত। এত দীর্ঘ সময় কেন লাগছে, এখনো কিছুই হচ্ছে না...'

হঠাৎ ডব্বেল বিছানার ওপর উঠে বসেন:

'শুনুন!'

'শুয়ে পড়ুন নড়াচড়া করবেন না।' ক্রুস দ্রুত ডব্বেলকে আবার বালিশের ওপর চেপে ধরেন।'

'শুনুন আমার মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে আমি যেন কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি!'

'ওহ্ এতক্ষণে!' উত্তেজিত ক্রুস বিড় বিড় করে বলে। 'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?'

'আমি দেখছি... আমার মনে হচ্ছে আমি দেখছি যে...' এবার ডব্বেলকেই প্রচণ্ড উত্তেজিত মনে হয়। 'আচ্ছা আমাকে বলুন তো অন্ধদের কি ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশন হয়?'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে আমাকে বলুন যে আপনি ঠিক কি দেখতে পাচ্ছেন?' ক্রুস চেয়ারটাতে ঠিক মতো বসতে বসতে চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু ডব্বেল কেমন যেন নিশ্চুপ আর তন্ময় হয়ে ড়ে, তার মুখটা বেশ বিষন্ন দেখায়, একাগ্রচিত্তে সে যেন কি একটা শুনছে মনে হয়। ক্রুস উঠে দাঁড়ায়, খুব সাবধানে পা ফেলে দরজার কাছে যায় এবং বেলটা চেপে ধরে। যখন নার্স এসে ঘরে ঢোকে তখন ক্রুস আধো ঘোরের মাঝে কথা বলে যেন তার ভয় হচ্ছিল কখন না জানি ডব্বেলের স্বপ্নটা ভেঙে যায়।

'নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট... জলদি... আমার একটা হার্ট এ্যাটাক হচ্ছে।'

'ডাক্তার! ডাক্তার ক্রুস! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারে প্রাণ এসছে।' ডব্বেল প্রলাপ বকার মতো করে বলে যাচ্ছিল। 'ওগুলো বয়ে যাচ্ছে... ঘন আলো... কুয়াশার মাঝে মিশে থাকা...'

'কি রং?' ক্রুস জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে প্রায় চিৎকারই করে ওঠে।

'আলোটার রং সাদা... না, এটা আসলে অন্ধকারের পটভূমিতে নীলচে রং। থোকা থোকা গুচ্ছ আলো আসছে যাচ্ছে তালে তালে ঢেউয়ের মতো।'

'ঢেউ!' হাঁস ফাঁস করে জানতে চায় ক্রুস। 'নিকুচি করেছি। আমারও মরার সময় হলো কিনা এখন! নার্স! এদিকে, আমাকে দাও, ঈশ্বরের দোহাই লাগে একটু তাড়াতাড়ি করো!' তিনি হাত বাড়িয়ে ট্যাবলেটা আঁকড়ে ধরেন, তারপর দ্রুত গিলে ফেলে ফের তার চেয়ারটাতে ফিরে যান। আস্তে আস্তে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। এবং তিনি মাঝে মধ্যে একটু হাঁপাতে থাকেন।

'বয়ে চলা আলো জিনিসগুলো... কোনো কোনোটা ছোট আবার কোনোটা বা লম্বা।' ডব্বেল তার দেখা জিনিসগুলো সম্বন্ধে হড়বড় করে বলে যেতে থাকে।

'তবে কি রেডিওটেলিগ্রাফ কাজ করতে শুরু করেছে,' ক্রুস আপন মনেই বলেন। 'আহ্, এইবার একটু শান্তি, এখন একটু ভালো বোধ করছি। অনেক ভালো এখন। বেশ বলুন আমি শুনছি আপনার কথা।'

'এটা অসাধারণ! ঠিক যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ছবি ভেসে উঠতে দেখার মতো। আমি সব রকমের আলো দেখতে পাচ্ছি। ছিট ছিট, তালি মারা, বৃত্তের অংশ, বৃত্ত, ঢেউ—কি না আছে, এগুলোর কোনো কোনোটা সুন্দর সুষম, ছোট ছোট রশ্মি বেরুচ্ছে, কাটাকুটি খেলছে, এদিক ওদিক ছুটছে, এর সাথে ও জুড়ে যাচ্ছে, আলাদা হচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে। নকশা, বিশাল একটা আলোর জাল যেন ছড়িয়ে রয়েছে... আহ কি জটিল! এগুলোকে বোঝাটা কি দুঃসাধ্য একটা কাজ।'

'দুর্দান্ত। অসাধারণ।' এবার ক্রুস নিজেই তার নিজের ফলাফলের প্রশস্তি শুরু করে। 'বোঝার ব্যাপারটা আপনার কাছে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে কেননা এখনো আপনি এই যন্ত্রপাতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেননি, বা বলা যায় যে আপনি বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে আলাদা করতে শেখেননি। এটাই স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম অমন জট পাকান আলো বলেই মনে হবার কথা। যদিও রেগুলেটরটার নিয়ন্ত্রণ শিখতে আপনার খুব একটা বেশি সময় লাগবে না। তখন আপনি জোরাল বৈদ্যুতিক প্রবাহ এবং হাল্কা বৈদ্যুতিক প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বন্ধু বর্ণনা করার সময় শব্দ ব্যবহারে দয়া করে অত কার্পণ্য করবেন না। আপনি আর কি কি দেখতে পাচ্ছেন?'

'আমার সামনে আর কোনো অন্ধকার নেই,' ডব্বেল বলেন। 'চারপাশের সবকিছুতেই যেন আলো জ্বলছে। কেবল ওগুলো। ঔজ্জ্বল্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ, আর সেই সাথে পার্থক্য রয়েছে রংয়ের: নীল, লালচে, সবুজাভ, বেগুনি, গাঢ় নীল। ঐ যে বাম দিকে থেকে একটা গোলাকার আলো দেখতে পাচ্ছি, অনেকটা আপেলের আকারের হবে, ওর থেকে নীলচে রশ্মি বেরুচ্ছে যেন ছোটা খাটো একটা সূর্য...'

'তারমানে?' ক্রুস তার উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে লাফ দিয়ে ওঠে। 'তুমি ওটা দেখতে পাচ্ছ? এটা হতে পারে না! এটা অবশ্যই দরজার ঐ গোলাকার হাতলটার ওপর জানালা গলে যে সূর্যের প্রতিফলন হচ্ছে সেটা। কিন্তু তুমি ওটা কিভাবে দেখতে পাচ্ছ?'

'আমি কোনো দরজার হাতল বা বল জাতীয় কিছুই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। আমি কেবল একটা গোলাকার আলো দেখতে পাচ্ছি যা থেকে নীলচে রশ্মি বেরুচ্ছে।'

'কিন্তু কেন? রশ্মিটা কিসের?'

'আমার মনে হয় ডাক্তার ক্রুস আমি বুঝেছি ব্যাপারটা। সূর্যালোকের শক্তি সম্ভবত এটার উপরিতল থেকে ইলেকট্রন টেনে আনছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই। আপনি ঠিক বলেছেন। এই ব্যাপারটার কথা আমি ভাবলাম না কেন? চলুন ছোট্ট একটা পরীক্ষা চালান যাক। আপনি ইলেকট্রিক ল্যাম্পটার পাতগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি সুইচ টিপে বৈদুতিক প্রবাহ চালু করছি, এবং...'

'হাঃ, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি! ছাদে উজ্জ্বল আলোর একটা রেখা দেখা যাচ্ছে,' ডব্বেল আঙুল তুলে দিকটা দেখিয়ে দেন এবং ক্রুস মাথা নুইয়ে সম্মতি জানান।

'... এবং তারপর নিচের দেয়ালে। দেখুন ঐ ঐ খান দিয়ে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎ পালিয়ে যাচ্ছে। আপনাকে ইলেকট্রিশিয়ান ডাকতে হবে। তারগুলো এসছে সম্ভবত অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে। তারপর এটা নেমে গেছে এবং বাইরে একদম রাস্তায়। আমি এমনকি বাল্বটাও দেখতে পাচ্ছি। না আসল বাল্ব না কিন্তু ইনক্যানডেসেন্ট ফাইবারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহ চলে তৈরি হওয়া একটা আলোর বাল্ব।'

'এটাকে বলে এডিসন ইফেক্ট।' ক্রুস মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন।

'আর আপনি কি জানেন ডাক্তার ক্রুস,' ডব্বেল বেশ উৎফুল্ল গলাতে বলে, 'আমি এরচেয়ে মজার একটা জিনিস এখনো দেখতে পাচ্ছি। এমনকি আমার মাথাটাকে না ঘুরিয়েও। আপনি কি উঠে বিছানাটার এপাশে একটু আসবেন? এই যে এটা আপনার মাথা, ঠিক না? এবং এইটা হবে আপনার হৃদপিণ্ড?'

'আপনি একদম ঠিক বলেছেন। হা ঈশ্বর, আপনি কি সত্যিই আমার হৃদপিণ্ড আর মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেখতে পাচ্ছেন? যদিও এটা আসলে অবাক হবার মতো তেমন কোনো ব্যাপার না। কেননা আমাদের শরীরের প্রতিটা কোষেরই রয়েছে জটিল রাসায়নিক এবং বৈদুতিক প্রভাব, কিন্তু মস্তিষ্ক আর হৃদপিণ্ড হল আসল জেনারেটর।'

'আপনার মস্তিস্ক থেকে হাল্কা বেগুনি আলো ছড়াচ্ছে, আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করলে যেটার উজ্জ্বলতা বেড়ে যাচ্ছে। আর যখন আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন তখন আপনার হৃদপিণ্ড জ্বল জ্বল করে উঠছে।' ডাব্বেল বলেন।

'ডব্বেল আপনি বিজ্ঞানের একটা অমূল্য সম্পদ। অপরিবর্তনীয়, একেবারে খাঁটি সোনার জিনিস। পৃথিবীর কোনো গ্যালভানোমিটারের সাহায্য নিয়ে আপনার মতো করে বলা সম্ভব না। এইবার আমি সত্যিই গর্ব বোধ করছি। যেমন আপনার জন্যও তেমনি আমার নিজের আবিষ্কার নিয়েও। আজ রাতে আমি আপনাকে গাড়িতে করে নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যাব আর আপনি আমাকে বলবেন যে কি কি দেখতে পান।'

এখন ডব্বেলের জন্য এক নতুন পৃথিবী উন্মোচিত হতে যাচ্ছিল। প্রথম যে সন্ধ্যায় ক্রুস তাকে গাড়িতে করে বাইরে ঘুরতে নিয়ে গেল সেই সন্ধ্যাটা ডব্বেলের মনে এক চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। এটা ছিল এক কথায় অসাধারণ অবিশ্বাস্য।

সব জায়গায় যেখান দিয়েই বিদ্যুৎ প্রবাহ গেছে সেখানেই ডব্বেল আলো দেখতে পান, এবং শহরে সেটা তো প্রায় সব জায়গায়। তিনি গাড়িগুলোর ম্যাগনিটো থেকে আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান, ট্রামের মোটরগুলোকে শহরময় আলোর গোলার মতো ছুটে বেড়াতে দেখেন, যার থেকে ছিটকে ছিটকে ইলেকট্রণ বেরিয়ে আসছে। মাথার ওপর ঝুলে থাকা ট্রামের তারগুলোকে গলে গরম হয়ে আসার তারের মতো লাগে, যেগুলোকে ঘিরে রেখেছে ম্যাগনেটিক লাইট। ডব্বেল দেখতে পাচ্ছিলেন অথবা বলা চলে যে আন্দাজ করতে পারছিলেন কিভাবে একটা আলোর রেখা, বিদ্যুৎ তারের ভিতর দিয়ে ট্রামের ছাদের তলা ছুঁয়ে ড্রাইভার প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে চলেছিল, সেখান থেকে মেঝের নিচে দিয়ে গিয়ে চেসিস এক্সেল হুইল রেল পার হয়ে একটা কেবল বেয়ে মাটির নিচে। নিচের থেকে অনেকগুলো তারের জটকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, আবার এখানে ওখানে ইনসুলিশনের জন্য সেই উজ্জ্বলতায় কম বেশিও ছিল। ডব্বেল যেটুকু বিদ্যুৎ বিভিন্ন ফাটল দিয়ে সরু ধারায় চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর পিছনে অনেক দূরে শহরের প্রান্ত সীমায় তিনি একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাচ্ছিলেন, যেন জলপ্রপাতের মতো আলোর তৈরি এক প্রপাত। সেটা ছিল বিশাল বিশাল জেনারেটর বসান একটা পাওয়ার স্টেশন।

হঠাৎ করে অনেকগুলো উঁচু দালান দেখতে পেয়ে তার কাছে খুব অদ্ভুত লাগে। অবশ্যই তিনি এগুলোর দেয়ালগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি

কেবল বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলো উজ্জ্বল জাফরী দেখতে পাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে ক্ষীণ আলোর সুতো, যেগুলো ছিল আসলে টেলিফোনের তার। গগনচুম্বি একেকটা কঙ্কাল, কিন্তু মনে মনে সেই কঙ্কাগুলো শরীর এঁকে নিয়ে দালানগুলো আলদা করে চিনতে ডব্বেলের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না।

দালানগুলো এখানে ওখানে তিনি আলোর জটলা দেখতে পাচ্ছিলেন, ইলেট্রিক মোটর।

আর সারা শহরটা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল রেডিও ওয়েভের আলো, সে আলো আকাশের তারার থেকে যেন ঝর্ণা ধারার মতো পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছিল। সূর্যের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের কসমিক রশ্মির তৈরি আলোর একটা নদী যেন বয়ে চলেছিল, সেই সাথে যোগ হয়েছিল খোদ পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আলো।

'সারা পৃথিবী খুঁজলে একজন বিজ্ঞানীও পাওয়া যাবে না যে নাকি আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন তা দেখতে পাবার জন্য নিজের চোখ দিতে রাজি হবে,' ক্রুস প্রবল উৎসাহে ডব্বেলের কথাগুলো শুনতে শুনতেই বলে। 'কিন্তু এবার কিছু বাস্তব কাজের কথা বলা যাক। আগামীকাল, ডব্বেল, আপনি এখানকার বড় বড় সব পত্রিকার প্রতিনিধিদের কাছে সাক্ষাৎকার দেবেন এবং পরশু দিন আমি আপনাকে নিয়ে হাজির হব সায়েন্টিফিক সোসাইটিতে উপস্থাপন করার জন্য।'

আবিষ্কারটার সর্বত্র বিশাল হই চই ফেলে দিল। দিনের পর দিন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে এই খবর বেরুতে থাকে আর ক্রুস তারিয়ে তারিয়ে তার যশের আনন্দটুকু উপভোগ করেন। ডব্বেল প্রায় বিরামহীন ভাবে সাক্ষাৎকার দিতে থাকেন এবং ক্যামেরার শার্টারও তার জন্য অবিরাম চলতে থাকে। তারপর তিনি নানা ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব পেতে শুরু করেন।

ওয়ার অফিস চাইছিল তিনি যেন তাদের ওখানে কাজ করেন যাতে শত্রুপক্ষ কোনো গোপন বার্তা পাঠানর চেষ্টা করলেই (ডব্বেল রেডিও ক্যাবলগুলোকে এক সারিতে চলা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যর আলো হিসাবে দেখতে পান) তা তিনি ধরে ফেলতে পারেন, যেহেতু তিনি শর্ট এবং লঙ্গ ওয়েভের সব ধরনের বেতার তরঙ্গই ধরতে পারতেন এবং তার জন্য তাকে কোনো ধরনের টিউনিং করার প্রয়োজনটুকুও হত না।

দেশের সামনের সারির কোম্পানী ইলেকট্রিরিপেয়ার তাকে একটি চাকরির প্রস্তাব করে যেখানে তার দায়িত্ব হবে ভূগর্ভস্থ কেবলে কোনো ধরনের ইনসুলেশনের সমস্যা আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। ঐ ফার্ম আসলে হিসাব করে দেখেছিল যে এই কাজের জন্য তাদের যে বিশাল যন্ত্রপাতির বোঝা এবং ইলেকট্রিশিয়ানের দল পুষতে হয় তাতে যে কোনো বেতনেই ডব্বেলকে নিয়োগ দেয়াটা লাভজনক। সবশেষে দি ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি তাকে প্রস্তাব করে তাদের গবেষণাগারে একটা জীবন্ত যন্ত্র হিসাবে যোগ দেবার জন্য, যেখানে তারা বিভিন্ন প্রকার ল্যাম্প, ভাল্ব, অসসিলোগ্রাফ, আল্ট্রা ভায়োলেট ইকুয়িপমেন্ট, এক্স-রে এবং কৃত্রিম গামা রশ্মি নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করে থাকে। তারা গবেষণা করছিল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক অসসিলেশন, বোম্বারডিং এটোম নিউক্লি এবং পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিল কসমিক রশ্মির নানা দিক নিয়ে। এই রকম একটা জায়গায় ডব্বেলের মতো একটা জীবন্ত যন্ত্র অদৃশ্য নানা রকমের রশ্মির ওপর গবেষণার জন্য খুবই উপযোগী।

ক্রুস ডব্বেলকে ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিসিটি কোম্পানীর প্রস্তাব গ্রহণ করার অনুমতি দেন।

'কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আমার সাথেই। সেটা আমার জন্য বেশি সুবিধার হবে। আমাদের চুক্তির সময় এখনো বেশ খানিকটা বাকি আছে এবং আমিও এখন পর্যন্ত যা যা পরীক্ষা চালাতে চেয়েছি তা শেষ করতে পারিনি।'

কাজেই ডব্বেল আবার কাজ করা শুরু করলেন। সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই তাকে দেখা যেত গবেষণাগারে ওজোন, রাবার এবং এসিডের মাঝে বসে আছেন। আর তারা সকালের সূর্যের আলোয় কি সন্ধ্যার ল্যাম্পের আলোতে অথবা অমানিশার মতো অন্ধকারে যেখানেই পর্যবেক্ষণ চালাক না কেন, ডব্বেল কিন্তু সারাক্ষণই তার আশ্চর্য আলোর তৈরি চাকতি মেঘ রশ্মি আর তারার মাঝেই থাকতেন। ডব্বেলের কাজ ছিল বসে বসে তার চারপাশে যা কিছু সে ঘটতে দেখে তার বর্ণনা দিয়ে যাওয়া আর এই পুরোটা সময় দু'জন স্টেনোগ্রাফার তার পাশে বসে সেই সব বর্ণনার প্রতিটা শব্দ লিপিবদ্ধ করে রাখছিল।

সময়ে সময়ে তিনি আশ্চর্য একেকটা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দিতে লাগলেন ফলে তাদের অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই তারা জানতে

পারছিলেন। যখন সবচে বড় স্টিম ইঞ্জিনটার চেয়েও বড় বিশাল আকারের নতুন জেনারেটরটা চালু করা হল তখন ডব্বেল বললেন:

'ওয়াও! এতো এক কথায় অবিশ্বাস্য! জেনারেটরটা পুরো শহরের বিরাট একটা অংশকে আলোয় ভরে দিয়েছে। এর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা দেখা যাচ্ছে শহরের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি এখন পুরো শহরটাকে দেখতে পাচ্ছি, মানে শহরটার বৈদুতিক প্রবাহের কঙ্কালটাকে। আমি সব দেখতে পাচ্ছি, এমনকি আপনাদেরকেও। আমার চারপাশে বন বন করে ইলেকট্রনেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখতে লাগছে ঠিক একটা জ্বল জ্বলে মৌচাকের মতো। ঐ যে সামনে মি. লার্ডনারের নাক থেকে টপ টপ করে স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে এবং মি. কর্লিস ল্যামোট্টের মাথাটাকে মনে হচ্ছে যেন গ্রীক পুরানের দেবতা মেড্যুসার মাথা, চার পাশে আগুনের শিখার তৈরি সাপ বেরিয়ে রয়েছে। আমি চার পাশের প্রতিটা ধাতব খণ্ডকে দেখতে পাচ্ছি, সব যেন জ্বলছে দাউ দাউ করে, টক টকে লাল হয়ে আছে, একটার সাথে আরেকটা উজ্জ্বল তার দিয়ে জোড়া রয়েছে।' ডব্বেলের মতো জীবন্ত একটা যন্ত্রের, যে নাকি চিন্তা করতে পারে এবং কথা বলতে পারে, সাহায্য পাবার ফলে তারা অনেকগুলো জটিল সমস্যাকে খুব সহজেই মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় যা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে চললে করাটা খুবই মুশকিল হত। ডব্বেলের এই জন্য খাতিরও যেমন ছিল তেমনি তাকে পারিশ্রমিকও দেয়া হত প্রচুর।

'আমি বিশ্বাস করি যে সব অন্ধ লোকদের তুলনায় আমি সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান। কিন্তু তারপরেও আমি নিশ্চিত যে আপনারা যারা আসলে দেখতে পান তারা আমার চেয়ে সুখী,' কথাটা একদিন সন্ধ্যায় ক্রুসের সাথে নিত্যকার মতো নিজের সারাদিনের পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেন ডব্বেল। এবং প্রতি সন্ধ্যাতেই তিনি ক্রুসের সাথে কাজ করে যাচ্ছিলেন কি করে গ্যালভানোস্কোপটাকে আরো উন্নত করা যায় তা নিয়ে।

তারপর আসে সেই দিনটা যেদিন তাকে ডেকে বলেন:

'মি. ডব্বেল, আজকেই শেষ দিন। এবং আমাদের চুক্তি শর্ত মোতাবেক আমি আপনাকে আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু সেটা যদি আমি করি তবে আপনি কিন্তু আপনার ইলেকট্রন দেখার ক্ষমতাটা হারাবেন। যে ক্ষমতার বলেই আজ আপনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, নানা রকমের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারছেন।'

'মর্যাদা? তা অবশ্যই ভোগ করছি। তবে একটা গবেষণাগারে থাকা একটা জীবন্ত যন্ত্রের মর্যাদা। না যথেষ্ট হয়েছে আমি আর চাই না, আমি একটা সহজ স্বাভাবিক মানুষ হতে চাই, একটা চলে ফিরে বেড়ান কথা বলা গ্যালভানোস্কোপ না।'

'সেটা সম্পূর্ণই আপনার ব্যাপার।' ক্রুস শ্লেষাত্মক হাসি সহই বলে। 'তাহলে চলুন চিকিৎসা শুরু করা যাক।'

শেষ পর্যন্ত ডব্বেলের জীবনের সবচে সুখের দিনটা এসে গেল। তিনি দেখতে পেলেন ক্রুসের পাংশুটে বলিরেখাময় মুখটা, তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে থাকা তরুণী নার্সটিকে, জানালার শার্সি বেয়ে নেমে আসতে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা, শরতের আকাশে ধূসর মেঘ আর গাছের হলুদ পাতা। যদিও সেই সময় প্রকৃতি তার রংয়ের ডালা মেলে ধরেনি কিন্তু সেটা খুবই তুচ্ছ একটা বিষয়। আসলে চোখ যদি থাকে তবে সে নিজেই রং খুঁজে নিতে পারে।

কয়েক মহূর্তের জন্য ডব্বেল এবং ক্রুস পরস্পরের দিকে অপলকে চেয়ে থাকেন। তারপর ডব্বেল এগিয়ে এসে ক্রুসের হাতটা ধরে সজোরে নাড়া দেন।

'আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না,' ডব্বেল বলেন। ক্রুস তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধটা ঝাকান।

'আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল আমার কাজটা সফল হয়েছে। আমি ভাইরোভাল নই, আমি কোনো হাতুড়ে বৈদ্যও না। এবং আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে আমি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছি। অল্প কয়েক দিনে পরেই ভাইরোভালের অপারেশনের নামটুকুও থাকবে না। কিন্তু আমি যথেষ্ঠ পেয়েছি। এই যে আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুস্থ স্বাভাবিক একটা মানুষ। তা এখন কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। আমি যেহেতু আর আপনার রোগী নই কাজেই আমার পক্ষে উচিৎ হবে না আপনার ঘাড়ের বোঝা হয়ে বসে থাকা। আমি আজই একটা হোটেলে উঠে যাব। তারপর আমার নিজের জন্য একটা ফ্ল্যাট আর কাজের খোঁজে বেরুব।'

'বেশ ডব্বেল, আমি আপনার সব রকমের সাফল্য কামনা করি।'

একদিন ক্রসকে এন্ট্রেন্স হলে কে যেন ডাকতে আসে। যেখানে কলার তোলা কোট গায়ে হাতে একটা টুপি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডব্বেল।তার টুপির কিনারা

থেকে টপ টপ করে মেঝেতে পানি ঝরে পড়ছিল। তাকে ক্লান্ত এবং অনেক বেশি পাতলা দেখায়।

'ডাক্তার ক্রুস,' ডব্বেল বলেন, 'আমি এসছিলাম আপনাকে আরেকবার আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাতে। আমি দেখতে পাচ্ছি...'

'ওসব কথা বাদ দিয়ে আগে আমাকে বলুন যে আপনি কি কোনো কাজ খুঁজে পেয়েছেন?'

'কাজ?' ডব্বেল খুব তিক্ত গলায় হেসে ওঠে। 'আমি দেখতে শুরু করেছি। সবকিছু খুব ভালো মতো দেখতে শুরু করেছি। ডাক্তার ক্রুস আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমাকে আবার অন্ধ করে দিন, ভালোর জন্য অন্ধ। যাতে কেবল ইলেকট্রনের ছোটাছুটি দেখতে পাই।'

'আপনি স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করতে চাচ্ছেন? কিন্তু সেটা তো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার!' ক্রুস অবাক হয়ে যান।

'এ ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। নইলে যেভাবে চলছে আমি না খেয়ে মারা যাব।'

'না, আমি এটা করব না। অবশ্যই না। লোকে আমার সম্বন্ধে ভাববেটা কি? আর তাছাড়া আপনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন। আমি ঐ ইলেক্ট্রনোস্কোপটার ওপর ইতোমধ্যে আরো কিছু কাজ করেছি, এবং যথেষ্ট উন্নতও করতে পেরেছি। আর একটা পেটেন্ট নিয়ে ওটা ইউনিভার্সাল ইলেক্ট্রিসিটি কোম্পানীর কাছে বেচেও দিয়েছি। এখন ওটা দিয়ে যে কেউ কারেন্ট দেখতে পাবে। কাজেই মি. ডব্বেল, কোম্পানীর আর এখন আপনার মতো অন্ধ আলোকদ্রষ্টার কোনো দরকার নেই।'

'ঠিক আছে।' সে সোজা ক্রুসের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে। 'তারা অন্তত এই বিশাল বিশৃঙ্খলাটা সামলাতে পারবে। চলি ডাক্তার ক্রুস।' তিনি দরজাটা টেনে দিয়ে চলে যান।

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে যায় এবং শরতের নীল আকাশে উজ্জ্বল সূর্য ওঠে।

অনুবাদ: আসরার মাসুদ

দ্য অ্যাস্ট্রোনাট

ভ্যালেন্টিনা জুরাভলিয়েভ

আমার সেন্ট্রাল অ্যাস্ট্রোনটিক্স আর্কাইভে আসার একটা ব্যাখা অল্প কথায় দেয়া উচিত, তা না হলে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমি মহাকাশযানের একজন ডাক্তার। এ পর্যন্ত তিনবার মহাকাশ অভিযানে গিয়েছি। আমার বিষয় হল সাইকিয়াট্রি, আজকাল এটাকে অ্যাস্ট্রোসাইকিয়াট্রিও বলা হয়। যে বিষয়টা নিয়ে এখন কাজ করছি আমি সেটা মোটামুটিভাবে ১৯৭০-এর আগে এবং পরের একটা সমস্যা। তখন মঙ্গলে যেতে এক বছরের মতো সময় লাগত আর বুধে যেতে লাগত দুই বছরের সামান্য কম। সে সময় ইঞ্জিনের ভূমিকা ছিল সামান্যই, কেবল পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া আর ফের নামার সময় কাজে লাগান হত। স্পেসশিপ ছোটার সময় অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল অবজার্ভেশনের কাজটা করত না কেউ, সে দায়িত্ব ছিল স্পূটনিকের উপর বসান মানমন্দিরগুলোর ওপর। মাসের পর মাস অ্যাস্ট্রোনাটরা তা হলে কী কাজ করত মহাশূন্যে? বলতে গেলে কিছুই না। বাধ্যতামূলক এই নিষ্ক্রিতার কারণে মনের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ত আর তার ফলে স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা ও মানসিক রোগ দেখা দিয়েছিল। বই পড়ে গান শুনে বছর-কে -বছর কোনো মহাকাশচারীর মাথা ঠিক থাকতে পারে না। কী কী ধরনের কাজ করা উচিত তা হলে? অবশ্যই শারীরিক খাটুনির মূল্যই আলাদা। সে জন্যই মহাকাশচারীদের বাছাই করার সময় যাদের নানা ধরনের শখ আছে তাদেরই বাছাই করা হত। শখকে তখন মনে করা হত অবাস্তব ব্যাপার হিসেবে, অবশ্য মহাকাশ অভিযানের সময় মহাকাশচারীকে একটা কিছু করার প্রেরণা দিত সেটা। তখন থেকেই আমরা অন্য এক জাতের

পাইলট পেতে শুরু করলাম, ম্যাথমেট্রিক্সের প্রতি যাদের প্রবল দুর্বলতা আছে, কিংবা যারা নেভিগেটরের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য মাথা ঘামাচ্ছে বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েও যারা কবিতা লিখছে।

মহাকাশচারীদের সার্টিফিকেটে নতুন একটি বিষয় হল তখন, বিখ্যাত টুয়েলভথ ক্লজ : 'ইন্টারেস্ট আদার দ্যান প্রফেশানাল'। যা হোক, রকেট প্রযুক্তিতে ইতোমধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। সব সমস্যার মোটামুটি একটা সমাধান পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছিল। আয়ন ইঞ্জিনের বদৌলতে রকেটে চেপে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে মাত্র কয়েকদিন সময় লাগে। তাই টুয়েলভথ ক্লজ অকেজো হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু কয়েক বছর পরে পুরোনো সমস্যাগুলো আবার অভিশাপের মতো স্বরূপ ফিরে পেল। ইতোমধ্যে মানুষ নক্ষত্রমণ্ডল ভ্রমণের ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে। তবু আয়ন রকেট আলোর গতিতে মহাকাশ পাড়ি দিলেও, কাছাকাছি কোনো নক্ষত্রে পৌঁছতে সময় লাগছে বিশ-পঁচিশ বছরের মতো...

তাই ফ্লাইং সার্টিফিকেটের টুয়েলভথ ক্লজকে কার্যকর করতে হয়। সাধারণত দেখা যায় রকেট কন্ট্রোল উড়ন্ত অবস্থায় শতকরা ০.০১ ভাগ সাফল্য দেখাতে পারে। ব্লাস্ট অফের পর টিভি মাত্র কয়েকদিন চালু থাকে, আরো মাসখানেক চলে রেডিও, তারপরে বছরের পর বছর কেটে যায় এমনিতেই।

সেকালে প্রতি রকেটে ছয় থেকে আট জন নভোচারী থাকত। ছোট ছোট কেবিন এবং দেড়শ ফুট লম্বা একটা গ্রিনহাউস থাকত। যাতে থাকত বেঁচে থাকার সব ধরনের উপকরণ। ভাবতেও আমাদের অবাক লাগত যে জিমনেশিয়াম, সুইমিংপুল, স্টেরিওথিয়েটার এন্টারটেইনমেন্ট গ্যালারি ছাড়া কী করে রকেট চালাত ওরা!

মূল কাহিনী থেকে সরে পড়েছি আমি, এবার আসল কথায় আসি।

আমি জানি না কারণ এখনো জানতে পারি নি কে আর্কাইভ বিল্ডিঙের ডিজাইন করেছিল। তবে কাজটা যেই করুক সে প্রতিভাধর স্থপতি কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিভার পাশাপাশি সাহসও ছিল বলতে হবে। সাইবেরিয়ান রিজার্ভার নদীর তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দালানটা। এই রিজার্ভারটা বানান হয়েছিল আরো বিশ বছর আগে, ওব সাগরে যখন বাঁধ দেয়া হয়েছিল। মূল

দালানটি তীরঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, কীভাবে এটা বানান হয়েছে কে জানে। দেখলে মনে হয় পানি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে বুঝি, যেন কোনো স্কুনার আকাশ পানে উড়াল দিতে প্রস্তুত।

আর্কাইভে সর্বসাকুল্যে জনা পনেরো লোকের দেখা পেলাম আমি। এদের কয়েকজনের সাথে আগেই কথা হয়েছে আমার, তবে অল্প সময়ের জন্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন এক লেখক প্রথম মহাকাশ অভিযানের তথ্য সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করতে। লেলিনগ্রাদ থেকে এসেছেন এক পণ্ডিত, মঙ্গল গ্রহের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করেন তিনি। ভারতীয় ভদ্রলোক একজন ভাস্কর। দুজন প্রকৌশলীর মধ্যে লম্বা যিনি তিনি এসেছেন সারাটভ থেকে, আর খাটোজন এসেছেন জাপান থেকে–যৌথভাবে একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন ওঁরা। অবশ্য কী ধরনের প্রজেক্ট সেটা তা জানি না আমি। জাপানি ভদ্রলোককে প্রজেক্ট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মৃদু হেসে তিনি বললেন, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না স্যার। আপনার মতো মানুষের মনোযোগ আর্কষণ করার মতো প্রজেক্ট নয় এটা।

আবারো মূল কাহিনী থেকে সরে পড়েছি আমি। কখন যে আসল কাহিনী শুরু করব, জানি না।

টুয়েলভথ ক্লজের ইতিহাস জানতে কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে এসেছিলাম আমি। এ নিয়ে একটু রিসার্চ করতে চাই আমি।

ওই দিন সন্ধ্যায়ই ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম আমি। প্রথম সারির মহাকাশচারী ছিলেন তিনি। রকেটের ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরণের ফলে তাঁর চোখ জোড়া নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ কায়দায় বানান চশমা চোখে লাগান তিনি–তিন স্তরের লেন্স আর নীল রঙের লেন্স ওটার। চশমা পরা অবস্থায় তাঁর চোখ জোড়া দেখা যায় না। তাঁকে কখনো হাসতে দেখা যায় না।

'বেশ'। আমার গবেষণার বিষয় আর আগমনের কারণ জানার পর বললেন তিনি, 'সেক্টর ০-১৪ থেকে কাজ শুরু করলেই মনে হয় ভালো হবে। মাফ করবেন, এই নিয়ম আমরাই চালু করেছি এখানে। অবশ্য আপনার তাতে কিছু অসুবিধা হবে না।' আমি বার্নাডের তারায় প্রথম অভিযানের কথা বললাম। যদিও লজ্জার কথা হল এই অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।

'আপনার গবেষণার বিষয়টা অন্যরকম', কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ভদ্রলোক, 'সিরিয়াস, প্রোসিওন আর সিগনি-৬১ সংক্রান্ত। ওইসব নক্ষত্রে চালান অভিযানগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?'

আমার গবেষণার সব বিষয় তিনি জানেন দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

'অ্যালেক্সি জারুবিন সেই প্রথম অভিযানের কমান্ডার ছিলেন', বলে চললেন তিনি, 'তাঁর সম্পর্কে জানা থাকলে আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর সহজ হয়ে যাবে। আধ ঘন্টার মধ্যে সব কাগজপত্র পেয়ে যাবেন আপনি।'

নীল চশমার পেছনে চোখ দুটো দেখা যায় না, তাঁর গলার স্বরে বিষাদের ছায়া স্পষ্ট।

কাগজগুলো এখন আমার টেবিলে পড়ে আছে। হলুদ ছোপ লেগেছে ওগুলোয়। কিছু কিছু জায়গায় কালির দাগ আবছা হয়ে গেছে। তখন ওরা কালি ব্যবহার করত। তবে অস্পষ্ট হলেও পড়তে অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ প্রত্যেকটি ডকুমেন্টের ইনফ্রা-রেড কপি করা আছে। লেমিনেটেড বলে বেশ দৃঢ় এবং মসৃণ আছে ওগুলো।

জানালা দিয়ে সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি আমি। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তীরে। তারপর মসৃণভাবে ফিরে যাচ্ছে আবার সাগরে, যেন কোনো পাঠক বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে...

বার্নাডের তারায় অভিযান সে যুগে খুবই বিপজ্জনক ছিল। পৃথিবী থেকে তারাটির দূরত্ব ছয় আলোকবর্ষ। রকেটকে অর্ধেক পথ পাড়ি দিতে হত দ্রুত গতিতে, বাকি অর্ধেক যেতে হয় অপেক্ষাকৃত মন্থর বেগে। হিসাব করে দেখা গেছে, যেতে আসতে সময় লাগত চৌদ্দ বছর।

রকেট আরোহীদের জন্য ওই সময়ে মাত্র চৌদ্দ মাসের সমান সময় কাজ থাকে। বিপদটা সেখানে যে এগুবার সময়টায় ইঞ্জিন চালু রাখতে হবে পুরোদমে।

রকেটে বাড়তি জ্বালানি রাখবার জায়গা ছিল না। আজকের মানুষ ওই অভিযানগুলোকে মারাত্মক বিপজ্জনক কাজ বলে মনে করে–কিন্তু এ ছাড়া তাদের কোনো উপায়ও ছিল না। ফুয়েল–ট্যাংকগুলো কানায় কানায় ভরে ফেলা হত, তারপরেও পথে কোনো কারণে দেরি হলে ফলাফল হত ভয়াবহ।

সিলেকশন কমিটির কাজের ধারা সম্পর্কিত অধ্যায়টা পড়লাম। ক্যাপ্টেন নির্বাচনের খুঁটিনাটি বিষয় সব লেখা আছে কাগজে। একের পর এক প্রার্থী বাদ পড়ে গেছে। কেউ বাদ না পড়াটাই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। প্রতিটি অভিযানই বিপজ্জনক, তাই ক্যাপ্টেনকে শুধু ইঞ্জিনিয়ার হলেই চলবে না, ঠাণ্ডা

মাথার লোক হতে হবে তাকে এবং অসম সাহসী। তারপর হঠাৎ সকলেই অ্যালেক্সি জারুবিনকে ক্যাপ্টেন নিয়োগের ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে বসল।

পাতা উল্টালাম আমি। চোখে পড়ল ক্যাপ্টেন অ্যালেক্সি জারুবিনের সার্ভিস রেকর্ড।

কয়েক মিনিট লাগিয়ে তিন পাতা পড়ার পর আমি বুঝতে পারলাম পোলাস নামে মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন হিসেবে অ্যালেক্সি জারুবিনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মানুষটি ছিল কোমল–কঠোর মেশান। প্রবীণ অধ্যাপকের মতো চিন্তাশীল মন আর সাহসী যোদ্ধার নির্ভীকতা দুটোই ছিল তাঁর। সেই কারণেই তিনি অতীতে বহু বিপজ্জনক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকেও লঙ্ঘন করার ক্ষমতা ছিল মানুষটার সহজাত।

নির্বাচকমণ্ডলী ক্যাপ্টেন নির্বাচন করলেন। রীতি অনুযায়ী ক্রু নির্বাচনের দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের। কিন্তু জারুবিনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। পাঁচ জন মহাকাশচারীর সাথে যোগাযোগ করলেন যাঁরা আগেও তাঁর সাথে অন্য অভিযানে যাত্রী ছিলেন। তাঁরা এই বিপজ্জনক অভিযানে যেতে রাজি আছেন কি না জানতে চাওয়া হল। উত্তরে জানালেন তিনি যদি নেতৃত্ব দেন তা হলে কোনো আপত্তি নেই।

এদের ছবিও আছে ফাইলে। দ্বিমাত্রিক সাধাকালো ছবি। ক্যাপ্টেন জারুবিনের বয়স তখন ছাব্বিশ, যদিও ছবিতে তাঁকে বেশ বয়স্ক দেখাচ্ছে। শক্ত চোয়াল, ভরাট মুখ, চাপা ঠোঁট, খাড়া নাক, ঢেউ খেলান চুলের নিচে অসাধারণ এক জোড়া চোখ-শান্ত কিন্তু বিজলির চমক ঠিকরে যাচ্ছে যেন।

অন্যদের বয়স আরো কম। এক দম্পতি আছেন দলে, দুজনই ইঞ্জিনিয়ার। যুগল ছবি তোলা হয়েছে তাঁদের। দুজন সবসময় একত্রে অভিযানে যেতেন। নেভিগেটরের চেহারা অনেকটা মিউজিশিয়ানের মতো লাগল। একজন যুবতী ডাক্তারও রয়েছে দলে। তার চেহারায় মুখে অশেষ গাম্ভীর্য। অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট আছেন, সারা মুখে যাঁর পোড়া দাগ। শনি গ্রহের উপগ্রহ ডায়োন-এ তাঁদের মহাকাশযান আছড়ে পড়লে ক্যাপ্টেনসহ মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন তিনি।

টুয়েলভথ ক্রুজে এলাম আমি পাতা উল্টে। ছবিই আসল সত্য প্রকাশ করে দিল। নেভিগেটর একাধারে গায়ক এবং গীতিকার। মহিলা ডাক্তার মাইক্রোবায়োলজির ওপর গবেষণা করছেন; অ্যাস্ট্রোফিজিস্টের শখ বিভিন্ন ভাষা শেখা, ইতোমধ্যে গোটা পাঁচেক ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছেন, এখন তিনি ল্যাটিন

আর প্রাচীন গ্রিক ভাষা নিয়ে ব্যস্ত; ইঞ্জিনিয়ার দম্পতি দাবার ভক্ত, দাবার ছক এবং ঘুঁটি নতুন ধরনের—দুটো করে রানী আর ৮১ ঘরের বোর্ড।

ক্যাপ্টেনের শখ ছবি আঁকা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিল। তাঁর মা ছিলেন পেশাদার চিত্রশিল্পী। হাতে ব্রাশ তুলে নেয়া ক্যাপ্টেনের ইচ্ছে ছিল অন্য কিছু করা। তিনি আবিষ্কার করলেন মধ্যযুগীয় চিত্রশিল্পীদের গুপ্ত বিদ্যা—তাদের রং ফোটান, কীভাবে রং মেশান আর ব্যবহার করার কায়দাকানুন। গবেষণাগারে এসব গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো শেষ ছিল না।

ছয় জন ভিন্ন ধরনের মানুষ এবং তাঁদের অতীত সম্পর্কে জানা গেল। ক্যাপ্টেন সকলকে এক জায়গায় আনলেন। ওঁরা সবাই ক্যাপ্টেনকে ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন, এমনকি তাঁকে অনুকরণ করারও চেষ্টা করেন। তাই সবাই বুঝতে পারলেন কতটা বিপজ্জনক হতে পারে অভিযানটা।

বার্নাডের তারার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল মহাকাশযান। পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর চমৎকারভাবে কাজ শুরু করল, অবশ্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল অবিরাম ধারায়। মহাকাশযান দ্রুত তালে ছুটে চলেছে এখন। প্রথমদিকে কাজ করা দূরে থাক এমনকি নড়াচড়াও বন্ধ থাকল। ডাক্তার কড়া নিয়ম বেঁধে দিলেন অভিযাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। ধীরে ধীরে মহাকাশচারীদের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দগুলো ফিরে এল। গ্রিনহাউস সাজান হল। তারপর বসান হল রেডিও টেলিস্কোপ। ফিরে এল জীবনের ছন্দ। রিঅ্যাক্টরের নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য কলকব্জার কাজে বেশি সময় লাগে না। নিয়ম করে প্রত্যেকে রোজ অন্তত চার ঘন্টা সময় দিতে লাগলেন যার যার ব্যক্তিগত বিষয়ে, তারপর আপন শখ পূরণে সময় কাটায়। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে। নেভিগেটর গানে সুর ভাঁজেন, যা হিট হতে বাধ্য। ইঞ্জিনিয়ার দম্পত্তি দাবা খেলেন; অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট তাঁর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

মহাকাশযানের লগ বুকে সবকিছু বিস্তারিত লেখা আছে : 'মহাকাশযান ছুটে চলেছে স্বাভাবিক গতিতে। রিঅ্যাক্টরসহ সব মেশিনারি কাজ করে যাচ্ছে। সকলের মনোবল তুঙ্গে।' তারপর হঠাৎ এক জায়গায় লেখা: 'হঠাৎ করে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। রকেট এখনো গন্তব্য থেকে বহু দূরে। গতকাল শেষবারের মতো পৃথিবীর টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখেছিল আমরা। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের শেষ সূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা আমাদের

জন্য খুব কষ্টকর।' তার দুটো লাইন পরে লেখা: 'রেডিও অ্যান্টেনা ঠিকমতোই কাজ করছে। আর সাত কি আটদিন আমরা রেডিও শুনতে পাব।' রেডিও এরপরে আরো বারোদিন চলেছিল বলে আনন্দিত হয়েছিল ওরা।

বার্নাডের তারায় দ্রুত পৌঁছার জন্য রকেটের গতি বাড়ান হল। মাস পেরিয়ে গেল। পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর নির্ভুলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগেই কম্পিউটারের সাহায্যে জ্বালানি খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল, এক ফোঁটাও অপচয় হচ্ছে না। বিপর্যয়টা যেন হঠাৎই নেমে এল।

একদিন হঠাৎ, সাত মাস কেটে গেছে তখন, রিঅ্যাক্টরের কাজে গোলমাল শুরু হল। কোনো কারণ ছাড়াই রিঅ্যাক্টরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ওইদিনের ঘটনা লগ বুকে লেখা রয়েছে: 'প্রতিক্রিয়াটা কেন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।' সেই যুগের বিজ্ঞানীরা জানতেন না পারমাণবিক জ্বালানিতে অতি সামান্য ভেজাল থাকলেও রিঅ্যাক্টরের কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হতে পারে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই সাগরের দিগন্তছোঁয়া তরঙ্গবিক্ষোভ চোখে পড়ল। বাতাস বেশ জোরে বইছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, দুরন্ত আক্রোশে তীরভূমি ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চায় যেন। একজন মহিলার হাসির শব্দ কানে এল। কিন্তু আমি মনকে বিক্ষিপ্ত হতে দিলাম না। ছয় জন মহাকাশচারীকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যেন আমি। তাদের চিনি—আমি বুঝতে পারছি স্পষ্ট কত বড় বিপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ওরা। হয়তো ভুল বলছি—তাতে কী আসে যায়? কিন্তু না, ঠিক পথেই আছি আমি। আমার মনে হচ্ছে চোখের সামনে যেন ঘটে যাচ্ছে সবকিছু।

বাদামি তরল টগবগ করে ফুটছে। বাদামি ধোঁয়া প্যাঁচানো পাইপ হয়ে কন্ডেনসারে ঢুকছে। টেস্ট টিউবের গাঢ় লালচে পাউডারের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার।

নিজেকে সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর বিদ্রোহ করল। স্বাভাবিকের চেয়ে চড়া গলায় কথা বলে উঠলেন তিনি। সাধারণত এমনভাবে কথা বলেন না।

'মনটাকে শক্ত করো নিকোলাই', বলতে বলতে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, 'কালকের মতো আজো একই ফল পেলাম। এস, বস।'

'তা হলে এখন কী করব আমরা?'

'কী করব?' দেয়ালঘড়ির দিকে একবার তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'সাপারের তো এখনো পঞ্চান্ন মিনিট বাকি। আলোচনা করার প্রচুর সময় আছে। দয়া করে সকলকে জানিয়ে দাও একটা আলোচনাসভা ডাকা হয়েছে।'

'বেশ, তাই হবে,' ইঞ্জিনিয়ার জবাবে বলল অন্যমনস্কভাবে। 'সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

তিনি বুঝতে পারলেন না ক্যাপ্টেন হেলাফেলায় সময় নষ্ট করছেন কেন। সেকেন্ডে সেকেন্ডে মহাকাশযানের গতি বাড়ছে। এখন জরুরি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দরকার।

'এটা দেখ,' হাতে ধরা টেস্টটিউবটা এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার কৌতূহল বাড়িয়ে দেবে। এটা লাল মারকারি সালফাইড, তেল তৈরি করে। কিন্তু আলোতে নেয়া হলে গাঢ় হয়ে যায় এটার রং।'

ইঞ্জিনিয়ারকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন কী করে অল্প-প্রতিরোধী মারকারি সালাফাইড তৈরি করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার টেস্টটিউবটা ঝাঁকালেন। টেবিলের ওপর একটা ঘড়ি রাখা, ইঞ্জিনিয়ারের কোনো উপকারে আসছে না সেটা। কারণ আধা মিনিটে মহাকাশযানের গতি সোয়া এক মাইল হারে বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে...বাড়ছে...

'আমি যাই বাকি সবাইকে জানাতে', ইঞ্জিনিয়ার বললেন।

সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় খেয়াল হল আর সময় গুনছেন না তিনি।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন। টেস্টটিউবটা সাবধানে র‍্যাকে রাখতে রাখতে কষ্টকর মুখে হাসি আনলেন। আতঙ্ক একটা সংক্রামক ব্যাধি। এসব ভাবতে ভাবতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি। চলন্ত রিঅ্যাক্টরের গুনগুন শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে যেন। মহাকাশযানের গতি বাড়ানর জন্য ব্যস্ত ইঞ্জিনগুলো।

দশ মিনিট বাদে মেস ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। পাঁচ মহাকাশচারী সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের পরনে মহাকাশচারীর ইউনিফর্ম। চোখমুখ দেখেই বোঝা যায়, পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে ওরা কত সজাগ।

'দেখা যাচ্ছে', ক্যাপ্টেন বললেন, 'একমাত্র আমিই ইউনিফর্ম পরতে ভুলে গেছি।' কেউ হাসল না, কথা বলল না।

'বস, বস', ক্যাপ্টেন বললেন, 'যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সভা। নিয়মমতো সবচেয়ে কম বয়সীকে দিয়েই শুরু করা যাক। লিনা, আমাদের করণীয় বিষয়ে তোমার মত কী?'

মহিলার দিকে ঘুরে তাকালেন ক্যাপ্টেন।

শান্ত গলায় মহিলা বললেন, 'আমি একজন ডাক্তার, আলেক্সি পাভলোভিচ। আমাদের এই মুহূর্তে সমস্যাটা সম্পূর্ণ যন্ত্র সম্পর্কিত। তাই আমার মতামত সবার শেষে জানালেই ভালো হবে বলে মনে করি আমি।'

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ালেন:

'যা ভালো বোঝ। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছু তুমি। মেয়ে হিসেবে বেশ ধূর্ত। বাজি ধরে বলতে পারি ইতোমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছ তুমি।'

কিছু বললেন না মহিলা।

'বেশ', ক্যাপ্টেন বলে চললেন, 'লিনা পরে তার মতামত জানাবে। তুমিই না হয় শুরু কর, সের্গেই।

অস্থিরভাবে হাত নাড়ল অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট, বলল, 'এটা এখতিয়ারে পড়ে না। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। তবে আমাদের যেটুকু জ্বালানি নষ্ট হয়েছে তাতে অন্তত বার্নাডের তারায় পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। মাঝরাস্তা থেকে আমাদের ফিরে যাবার প্রয়োজন আমি অন্তত দেখি না।'

'কেন না?' বললেন ক্যাপ্টেন, 'একবার বার্নাডের তারায় যাবার পর আবার পৃথিবীতে ফেরার মতো প্রয়োজনীয় জ্বালানি যে অবশিষ্ট থাকবে না সেটা তো পরিষ্কার। সেক্ষেত্রে, মাঝরাস্তা থেকে ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি', অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট চিন্তাভাবনা করে বলল, 'কিন্তু আপনি ভালোই জানেন ঠিকই ফিরে আসতে পারব আমরা। অবশ্য নিজেদের চেষ্টায় নয়, উদ্ধারকারী রকেটের সাহায্যে। ওরা যখন দেখবে আমরা ফিরছি না তখন উদ্ধারকারী রকেট পাঠাবে। মাহাকাশবিজ্ঞানের উন্নতির এটাই প্রমাণ।'

'ব্যাপারটা তা হলে এই', হাসিমুখে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কেবল সময়ের ব্যাপার। আমরা এগোতে পারি তা হলে? জর্জি তুমি কী বল! এটা তোমার এখতিয়ারেই পড়ে।'

নেভিগেটর লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন এক পাশে।

'বস, বস', ক্যাপ্টেন বললেন, 'বসে, ধীরেসুস্থে বল।'

'ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না!' প্রায় চেঁচিয়ে বললেন নেভিগেটর। 'এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের। ফিরে যাওয়ার কথা

ভাবছি কেন আমরা? এই অভিযানটা যে বিপজ্জনক সে তো অভিযানের শুরু থেকেই আমরা জানি সবাই। অথচ প্রথম বিপদের মুখোমুখি হতেই লেজ গুটিয়ে কেটে পড়তে চাইছি। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, এগিয়ে যাব আমরা, শুধু এগিয়ে যাব। অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারই তো করেছিলাম আমরা, তাই না?'

'বেশ বলেছ', আলস্যভরে কথা বললেন ক্যাপ্টেন। 'অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কথাটা খারাপ না। ইঞ্জিনিয়াররা এ ব্যাপারে কী ভাবছ? লিনা, নিকোলাই তোমাদের মত কী?'

নিকোলাই একবার তার স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন লিনা। তারপর বলতে শুরু করলেন নিকোলাই, স্থির শান্ত গলায়:

'বার্নাডের তারার উদ্দেশে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য হল তারাটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। কিন্তু আমরা ছয় জন ওখানে গিয়ে নতুন কিছু কেবল আবিষ্কার করলে তার কোনো মুল্য থাকবে না যতক্ষণ না মানবজাতি তা জানতে পারছে। আমরা বার্নাডের তারায় পৌঁছানর পর যদি ফিরে আসবার সম্ভাবনা নাই থাকে তা হলে আর আবিষ্কারে ফায়দা কী? সের্গেই বলছে আমাদের উদ্ধার করতে একটা উদ্ধারকারী রকেট আসবে। আমিও মনে করি এটা সম্ভব। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে উদ্ধারকারী রকেটের যাত্রীরাই সকল আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেড়ে নেবে। তা হলে আমরা কী করছি সেটা প্রমাণ করব কীভাবে? মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে কী অবদান থাকবে আমাদের তখন? আসলে আমরাই আমাদের ক্ষতি করেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। পৃথিবীর ওরা আমাদের ফেরার অপেক্ষায় আছে। এখন ফিরে গেলে সময়ের অপচয় হবে কম। নতুন করে আবার অভিযানের কথা ভাবা যাবে। আমাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে এটা। মাত্র কয়েকটা বছর নষ্ট হবে, কিন্তু তারপরও যেসব তথ্য জানা যাবে সেটা একেবার ফেলনা নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নই। এই মুহূর্তেই পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া উচিত।'

দীর্ঘ এক নীরবতা নেমে এলে মেসঘরে। তারপর মহিলা জিজ্ঞেস করলেন:

'আপনি কী ভাবছেন, ক্যাপ্টেন?'

মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুললেন ক্যাপ্টেন। 'আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়াররা ঠিক কথাই বলেছে। ওদের কথাগুলো কড়া হতে পারে তবে সত্যি এ যুক্তিসঙ্গত। একটা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি আমরা। যদি সে আবিষ্কার পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারি তা হলে অভিযান তো অর্থহীনই। নিকোলাই ঠিকই বলেছে...'

জারুবিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেসঘরে দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন। হাঁটাও মুশকিল। কারণ থ্রি জি-লোড এখন রকেটের গতি বাড়িয়ে চলেছে। থরথর করে কাঁপছে রকেট।

'উদ্ধারকারী রকেটের চিন্তাটা বাদ দিতে হবে', ক্যাপ্টেন বলে চললেন, 'আসলে এখন আমাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে। এক. সময় নষ্ট না করে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া। দুই. জ্বালানির অভাব সত্ত্বেও মূল গন্তব্য বার্নাডের তারায় পৌঁছান এবং আবার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া।'

'তা কী করে সম্ভব?' নিকোলাই জিজ্ঞেস করলেন।

জারুবিন তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'তা জানি না। এখনো কোনো জবার পাই নি আমি। তবে বার্নাডের তারা এখনো এগারো মাস দূরত্বে। তোমরা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে আমরা ফিরে যেতে পারি। তোমরা আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করে ফেলতে পারব। তারপর... অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই একটা পথই দেখতে পাচ্ছি আমি। তোমরা কী বল? লিনা কী বল তুমি?'

তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মহিলা।

'আপনি খুবই চতুর। বাজি ধরে বলতে পারি আপনি ইতোমধ্যে একটা সম্ভাব্য সমাধানের কথা ভেবে ফেলেছেন।'

ক্যাপ্টেন ওঁর কথা শুনে হাসলেন।

'বাজিতে তুমি হেরে গেছ। আমি আসলে কিছু ভাবি নি। তবে একটা উপায় পেয়ে যাব ঠিকই।'

'আপনাকে আমার বিশ্বাস করি', নিকোলাই বললেন, 'আপনার ওপর আমাদের সবার অবিচল আস্থা।' একটু থামলেন তিনি, তারপর যোগ করলেন, 'তবুও, খোলাখুলি বলছি আমি এখনো কোনো সম্ভাবনার আলো দেখতে পাচ্ছি না। বার্নাডে পৌঁছার পর পোলাসকে চালানর জন্য আমাদের হাতে থাকবে মাত্র আঠারো শতাংশ জ্বালানি। পঞ্চাশ শতাংশ থাকার কথা। অথচ আপনি বলছেন উপায় একটা বের হবেই। তা হলে আমরা এগিয়ে যাবারই পক্ষপাতী। জর্জির কথায় সুর মিলিয়ে বলতে হয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সে জন্যই তো আমাদের এই অভিযান এত রোমাঞ্চকর।'

মৃদু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছে জানালার পাল্লাগুলো। বাতাসের ঝাপটা লাগছে কাগজে। সমুদ্রের নানা গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। জাহাজে উঠলে এ গন্ধ মেলে

না। ওখানে কন্ডিশনার বাতাসকে বিশুদ্ধ করে, প্রয়োজনমতো তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা দেয়, ফলে বাতাস ডিস্টিল্ড ওয়াটারের মতো নীরস হয়ে যায়। সব রকম কৃত্রিম সুগন্ধ দিয়ে দেখেছি তাতে কোনো লাভ হয় নি, সাধারণ মানের সৌরভ ওগুলো। পৃথিবীর বাতাসের সৌরভ নকল করা কঠিন। অথচ এখন আমি সমুদ্র আর স্যাঁতসেঁতে বাতাসের গন্ধ পাচ্ছি। শরতের পাতা ঝরা বাতাসের গন্ধ, মাটি এবং কাঁচা রঙের গন্ধও পাচ্ছি।

বাতাসের কাগজের পাতা উল্টে যাচ্ছে... ক্যাপ্টেন এখন কী করছেন? পোলাস যখন বার্নাডের তারায় পৌঁছাল তখন জ্বালানি তেলের পরিমান কমে আঠার শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশ থাকার কথা...

সকালে ডাইরেক্টরের সাথে দেখা করলাম, তাঁর কাছে জানতে চাইলাম জারুবিনের আঁকা কোনো ছবি আছে কি না।

'নিশ্চয়ই আছে। ওপর তলায় যেতে হবে আমাদের সে জন্য,' ডাইরেক্টর বললেন। 'কিন্তু... অভিযানের পুরো রিপোর্টটা পড়া হয়েছে আপনার?'

আমার জবার শুনে মাথা নাড়লেন তিনি।

'বুঝতে পারছি। আমিও তাই ভেবেছিলাম। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন তাঁর ঘাড়ে একটা বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন... আপনি কি তাকে বিশ্বাস করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও।'

অল্পক্ষণের জন্য তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে চশমা ঠিকমতো বসিয়ে নিলেন তিনি।

'চলুন, যাওয়া যাক।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি। 'আপনার পড়া এখনো শেষ হয় নি।' ডাইরেক্টর বলতে শুরু করলেন, 'আমার যতদূর মনে আছে একশো পাতা থেকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব। জারুবিন ইটালিয়ান রেনেসাঁ গুরুদের শিল্পের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন। আঠার শতক থেকে ছবি আঁকার টেকনিকের অবনতি শুরু হয়েছিল। এ নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছে, কিন্তু সব ভাবনা ভাবনাই থেকে গেছে। সে সময়কার চিত্রশিল্পীরা তেলের মিশ্রণটা বেশি করতেন না বলে ছবি তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু দ্রুতই তা ঝাপসাও হয়ে যেত। বিশেষ করে নীলের বেলায়। জারুবিন... আপনি নিজেই দেখুন ওর কর্মগুলো।'

সূর্যালোকিত একটি চাপা গ্যালারিতে টাঙান রয়েছে ছবিগুলো। মনকে একটা ধাক্কা দিল তা হচ্ছে প্রত্যেকটি ছবিই আঁকা হয়েছে লাল, হলুদ, বেগুনি এবং নীল রঙে।

'এই ছবিগুলো পরীক্ষামূলক' ডাইরেক্টর বললেন, 'টেকনিকটা রপ্ত করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।' নীল রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা পর্যায়।

নীল আকাশের বুকে ভাসছে দুটো ছেলেমেয়ে পাশাপাশি। তাদের পিঠে ডানা। পুরো ছবিটাতে নীল রঙের কারুকাজ। কোথাও কোনো শেডের ছাপ নেই। ছবির বাঁ কোণে রাতের দৃশ্য আর অন্য কোণে দিনের দৃশ্য। ডানাওয়ালা মানবমানবীর রং হালকা নীল থেকে গাঢ় বেগুনি।

আরো ছবি দেয়ালে ঝুলছে। 'লাল রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা' স্তরে হল: অজানা এক গ্রহের আকাশে দুই সূর্য। সূর্যের রং ঈষৎ কমলা। 'বাদামি রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা' স্তরে হল : রূপকথার জঙ্গল।

ডাইরেক্টর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চশমার নীল টিনটেড কাঁচের ভেতরে দেখার চেষ্টা করলাম। চোখ দুটো দেখতে পেলাম না।

'পুরো রিপোর্টটা পড়ুন,' নরম গলায় বললেন, 'তারপর আপনাকে আরো ছবি দেখাব আমি। তা হলে অনেক কিছুই বোঝা সহজ হবে আপনার জন্য।'

পাতার পর পাতা পড়ে যাচ্ছি দ্রুত। যতটা সম্ভব পড়ছি একটা পাতাও বাদ না দিয়ে।

পোলাস সশব্দে ছুটে যাচ্ছে বার্নাডের তারার দিকে। সর্বোচ্চ গতি অর্জন করেছে ওটা। প্রায় ভেঙে যাবার যোগাড় ইঞ্জিন। লগ বইয়ের লেখা থেকে জানা যায় মহাকাশযানের ভেতর সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। কারো স্নায়ু দুর্বল হয় নি বা অসুখ হয় নি। ক্যাপ্টেনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কেউ কোনো অভিযোগ তোলে নি। আর ক্যাপ্টেন আগের মতো শান্ত আত্মবিশ্বাসী এবং হাসিখুশি রয়েছেন, তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত সারাক্ষণ।

একা কেবিনে থাকার সময় কী ভাবেন তিনি? মহাকাশযানের লগ বই নেভিগেটরের ডায়েরিতে তার কোনো উত্তর নেই। তবে একটা চমকপ্রদ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির রিপোর্ট। কুলিং মেশিন নষ্ট হওয়ার ব্যাপার লেখা রিপোর্টটায়। স্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষায় যন্ত্রপাতির ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে তাতে। তবে দু জায়গায় লেখা আছে দেখলাম : 'তুমি মত পরিবর্তন করলে এখনই পৃথিবীতে ফিরে যাও। তাতে

কিছু হারাতে হবে না...' ক্যাপ্টেন আবার এ কথার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, 'আমরা বার্নাডের তারায় পৌঁছে ক্ষতি পুষিয়ে নেব।' তার মানে 'না বন্ধু, আমি মত পরিবর্তন করি নি।'

উনিশ মাস পর মাহাকাশযান, তার গন্তব্যে পৌঁছল। হালকা লাল এই তারার একটি মাত্র গ্রহ এবং আকার অনেকটা পৃথিবীর সমান। পুরো গ্রহ গভীর বরফে ঢাকা। পোলাস নামার চেষ্টা করল। কিন্তু আয়ন জেট বরফে ঢেকে যাওয়াতে প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ক্যাপ্টেন অন্য একটি জায়গা বাছলেন, আবারো বাদ সাধল বরফ। পাঁচবার ব্যর্থতার পর ছয়বারের বার হালকা বরফে ঢাকা শক্ত পাথুরে জমিতে নামল মাহাকাশযান।

বার্নাডের তারায় নামার পর থেকে লগ বুক লাল কালি দিয়ে লেখা হয়েছে।

গ্রহটা মৃত। বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পরিপূর্ণ বাতাস, অথচ কোথাও কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর চিহ্ন নেই। থার্মোমিটারে গ্রহের তাপমাত্রা মাপা হল শূন্যের প্রায় ৫৮° ফারেনহাইটের নিচে। 'একদম বাজে গ্রহ,' নেভিগেটর তার ডায়রিতে লিখে লেখেছেন, 'অথচ তবু সুন্দর! অনেক নতুন কিছু আবিষ্কার করা যাবে!' এবং সত্যিই তাই হয়েছে। আজকে আমাদের জ্ঞানের কাঠামো এবং তারা সম্পর্কে জ্ঞান যখন অত্যন্ত দ্রুত বাড়ছে তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে পোলাস-এর এই অভিযান অত্যন্ত মূল্যবান। গ্যাসীয় পদার্থে ভরপুর লালচে ছোটখাটো বার্নাডের তারা নিয়ে পড়াশুনা আমাদের এখনো প্রাথমিক রয়ে গেছে।

লগ বই... বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট... অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট-এর কাগজপত্রে তারার ক্রমবিকাশ লেখা হয়েছে... শেষমেশ ফেরার জন্য ক্যাপ্টেনের নির্দেশের খোঁজ করতে লাগলাম আমি। নির্দেশটা এল আকস্মিক। প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা খেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, দ্রুত পাতা উল্টে যাচ্ছি। নেভিগেটরের ডায়রিতে এ প্রসঙ্গে লেখা আছে চোখের পলক না ফেলে পড়ে গেলাম আমি।

একদিন জারুবিন সবাইকে তাঁর কাছে ডাকলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে এবার ফেরার জন্য তৈরি হও।'

পাঁচ জন মহাকাশচারী তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। টিক টিক করে চলছে দেয়ালঘড়ি...

পাঁচ জন মাহাকাশচারী ক্যাপ্টেনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। সকলেই ক্যাপ্টেন এরপর কী বলেন তার অপেক্ষা আছেন।

'ফেরার জন্য তৈরি হও', ক্যাপ্টেন আবারো কথাটা বললেন, 'তোমরা সবাই জান ফেরার জন্য আমাদের হাতে আছে মাত্র আঠার শতাংশ জ্বালানি। তবু ফিরে যাবার একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমে রকেটের ওজন কমাতে হবে। কন্ট্রোলার বাদে সব ভারী ইলেক্ট্রনিক গিয়ার ফেলে দিতে হবে রকেট থেকে।' নেভিগেটর কিছু বলতে চেয়েছিলেন হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলেন তাকে তিনি। 'কাজটা করতেই হবে। এমনকি খালি ট্যাংক আর গ্রিনহাউসের কিছু অংশও ফেলে দিতে হবে এই গ্রহে। তবে এতেই সব সমস্যা মিটবে না। যাত্রার প্রথম মাসে মহাকাশযানের অ্যাক্সিলারেশন খুব একটা বাড়ান সম্ভব না, তাই প্রচুর জ্বালানি খরচ হবে। আরাম আয়েশ বাদ দিতে হবে আমাদের। জি ৩-এর তুলনায় জি ১২-তে পোলাস যাত্রা শুরু করবে।'

'অত কম ওজনে মহাকাশযান কন্ট্রোল করা যাবে না,' নিকোলাই আপত্তি জানালেন। 'পাইলটের অসম্ভব হয়ে যাবে–'

'আমি জানি', ক্যাপ্টেন তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'যাত্রার প্রথম এক মাস মহাকাশযান এখান থেকে কন্ট্রোল হবে মানে এই গ্রহ থেকে। সেই জন্য আমাদের যে কোনো একজনকে এই গ্রহে থেকে যেতে হবে। দাঁড়াও, কথা বোলো না, আগে কথা শেষ করতে দাও। মনে রেখো এ ছাড়া কোনো পথ নেই। ফিরতে চাইলে কাজটা করতেই হবে। মন দিয়ে শোনো। তোমাদের দুজনকে মানে ইঞ্জিনিয়ার দম্পতিকে বলছি, তোমাদের বাচ্চা হতে যাচ্ছে তাই তোমাদের এই গ্রহে থাকা চলবে না। আমি এও জানি লিনা একজন ডাক্তার সে জন্য তোমাকে মহাকাশযানে থাকতে হবে। এ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট বলে সের্গেইকে ফিরে যেতে হবে। জর্জি আবেগপ্রবণ, তাই সেও বাদ তা হলে বাকি রইল কে? আমি। আমাকেই থাকতে হচ্ছে এই গ্রহে। কোনো তর্ক নয়। যা বলেছি ঠিক সেইভাবে কাজ করে, যাও।'

ক্যাপ্টেন জারুবিনের হিসাবের একটি রিপোর্ট দেখছিলাম আমি। ডাক্তার বলে এই জটিল গাণিতিক বিশ্লেষণের গভীরে প্রবেশ করতে পারলাম না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট। হিসাবে কোনো ভুল নেই। প্রায় সবকিছু রকেট থেকে খুলে নেয়া হয়েছে। টেকঅফের জন্য জি-লোড একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। গ্রিনহাউসের বেশিরভাগ অংশই রেখে দেয়া হয়েছে গ্রহে।

অভিযাত্রী দলের প্রতিদিনকার খাবারে বরাদ্ধের ওপর রেশনিং আরোপ করা হয়েছে। জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহের দুটো বরাদ্দের মাইক্রোরিঅ্যাক্টর নামিয়ে দেয়া হয়েছে গ্রহে। মহাকাশযানের প্রায় সকল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম খুলে দেয়া হয়েছে। কোনো বিপদ ঘটলে মহাকাশযান বার্নাডের তারায় ফিরে আসতে পারবে না। ঝুঁকির মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে মহাকাশযানের–ক্যাপ্টেন ডায়রিতে লিখে রেখেছেন, তবে এই গ্রহে যে থেকে যাবে তার ঝুঁকি বেড়েছে একশ গুণ।

ক্যাপ্টেন জারুবিনকে চৌদ্দ বছর উদ্ধারকারী মহাকাশযানের অপেক্ষায় থাকতে হবে। চৌদ্দ বছর বরফশীতল এক গ্রহে একা থাকতে হবে...। ওহ্ ভাবা যায় না।

আবার হিসাবের দিকে তাকালাম। শক্তিই হল প্রধান বিবেচ্য। গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের জন্য দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চিত রাখতে হবে। বিপদকালীন সময়ের জন্য কোনো শক্তি সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব না।

গ্রহে ক্যাপ্টেন জারুবিনের বাসগৃহের একটি ফটো দেখলাম। গ্রিনহাউসের একটি অংশ দিয়ে বাসগৃহটা তৈরি করা হয়েছিল। পাতলা স্বচ্ছ দেয়ালের ওপাশে দেখা যায় দুটো মাইক্রোরিঅ্যাক্টর এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী। গ্রাইন্ড কন্ট্রোলের অ্যান্টেনাটি ছাদের উপর লাগান। ছবিতে আরো দেখা যাচ্ছে বাসগৃহের চারপাশে কেবলই বরফের বিস্তার। ধূসর আকাশে জ্বলজ্বল করছে বার্নাডের তারা। সূর্যের চারগুন বড়, চাঁদের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল।

দ্রুত লগ বুকের পাতা উল্টালাম আমি। ক্যাপ্টেনের শেষ মুহূর্তের কিছু নির্দেশ লেখা রয়েছে। মহাকাশযানের যাত্রার সময়ের রেডিও যোগাযোগের ব্যাপারে লিখেছেন তিনি। তারপর হঠাৎই লেখা রয়েছে শব্দ : ব্লাস্ট-অফ।

তার পরের লেখাগুলো অস্পষ্ট, ঠিক যেন কোনো বাচ্চা ছেলে আঁকিবুকি। আঁকাবাঁকা, অসমান এবং ভাঙা ভাঙা ভাবে ১২ জি সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

আমি অনেক কষ্টে লেখাগুলো পড়লাম। প্রথমে লেখা: সবকিছুই ঠিকঠাক আছে তবে ১২ জি-এর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে...। দুদিন পরের কথা লেখা: অনেক কষ্ট, অনেক... রিঅ্যাক্টর দুটো ঠিকমতো কাজ করছে।

তার পরের দুটো পাতায় কিন্তু লেখা নেই। তৃতীয় পাতায় কালি লেপ্টে দেয়া হয়েছে যেন। সোজাভাবে লেখা রয়েছে : গ্রাউন্ড কন্ট্রোল দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিছু একটা আলোর পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তারপরে একই পাতার

নিচের দিকে লেখা রয়েছে : গ্রাউন্ড কন্ট্রোল আবার কাজ করতে শুরু করেছে। শক্তি নির্দেশক কাঁটা চারের ঘরে রয়েছে। ক্যাপ্টেন তার সকল শক্তি আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে থামানর কোনো উপায় নেই আমাদের। এর মানে উদ্ধারকারী মহাকাশযান ক্যাপ্টেন জারুবিনের কাছে সময়মতো পৌঁছুতে পারে নি....

লগ বই বন্ধ করে দিলাম আমি। শুধু ক্যাপ্টেন জারুবিনকে নিয়ে ভাবতে চাই না। অনুমান করতে পারি গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের শক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত কমে আসছে। হঠাৎ নির্দেশক যন্ত্র তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল তারপর...

নির্দেশক যন্ত্রে তীক্ষ্ণ শব্দে বিপদ সংকেত বাজছে। নির্দেশক কাঁটা দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। শক্তির রশ্মিপথে আবার বাধা দেখা দিয়েছে। হাত থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল।

ক্যাপ্টেন জারুবিন স্বচ্ছ দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সূর্য ডুবছে দূর দিগন্তে। বরফ প্রান্তরে বাদামি ছায়া পড়ছে দ্রুত। বাতাসে তুষার উড়ছে। ফলে লালচে আকাশ যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চারদিক রহস্যময়তায় ঢেকে যাচ্ছে যেন।

নির্দেশক যন্ত্র বেজে চলেছে তীক্ষ্ণ শব্দে। এখন যতটা শক্তি সঞ্চিত আছে তা দিয়ে কন্ট্রোল বজায় রাখা সম্ভব নয়। জারুবিন এক দৃষ্টিতে বার্নাডের তারা ডোবা দেখতে লাগলেন। তার পেছনে রাখা নেভিগেটরস গিয়ারের ইলেক্ট্রনিক আলো জ্বলছে- নিভছে।

লালচে আলো যেন হঠাৎই দিগন্তের ওপারে হারিয়ে গেল। তবে হারিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো লালচে আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল একবার, প্রান্তরে তির্যকভাবে এসে পড়ল। তারপর চারদিকে নিকষ অন্ধকার।

নিয়ন্ত্রক বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন জারুবিন। বন্ধ করে দিলেন নির্দেশক সংকেত। আর নড়ছে না নির্দেশক কাঁটা। শক্তি নিয়ন্ত্রক চাকাটি ঘোরাতে লাগলেন জারুবিন। গ্রিনহাউসের ভেতরটা যান্ত্রিক গুঞ্জনে ভরে গেল। জারুবিন চাকা ঘুরিয়ে চললেন যতক্ষণ না ওটা আটকে যায়। তারপর নিয়ন্ত্রক বোর্ডের পেছনে গেলেন তিনি। সেফটি লক্ খুলে চাকাটি আরো দুবার ঘোরালেন। তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক গুঞ্জনে ভরে গেল সারা ঘর। থরথর করে কাঁপছে ঘরের ভেতরটা।

ক্যাপ্টেন জারুবিন দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। তাঁর দু হাত কাঁপছে। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর ঠাণ্ডা কাঁচে ঠেকালেন চিবুকটা।

এবার অপেক্ষার পালা। অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ অতি শক্তিশালী নতুন সংকেত মহাকাশযানে পৌঁছে আবার ফিরে না আছে।

ক্যাপ্টেন জারুবিন অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি অপেক্ষা করছেন। সময় কেটে যাচ্ছে ধীর গতিতে। একদিন দুটো মাইক্রোরিঅ্যাক্টর হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল। কুলিং মেশিন কাঁপতে শুরু করল। কাঁপতে লাগল স্বচ্ছ দেয়াল।

অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন জারুবিন।

অবশেষে হঠাৎ যেন অদৃশ্য আকর্ষণ তাঁকে নিয়ন্ত্রক বোর্ডের কাছে নিয়ে এল। স্বাভাবিক হয়ে আসছে নিয়ন্ত্রক কাঁটাটি। মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট শক্তি এখন রয়েছে তাঁর হাতে। মুচকি হাসলেন জারুবিন, বললেন, 'এই তো।' তাকালেন কনসাম্পশেন ডায়ালের দিকে। আগের তুলনায় ১৪০ গুণ বেশি কনসাম্পশেন রয়েছে।

সেদিন রাতে আর ঘুমালেন না ক্যাপ্টেন। ইলেক্ট্রনিক নেভিগেটরের জন্য নতুন প্রোগ্রাম ফিট করলেন কম্পিউটারে। শক্তির ঘাটতি পুষিয়ে ওঠা গেছে আপাতত।

বাতাস বরফের বিস্তারে বাতাস, বরফকুচি উড়িয়ে নিয়ে গেল। হালকা উত্তুরে বাতাস বইছে দিগন্তের ওপাশে।

তীক্ষ্ণ শব্দ করে দুটো মাইক্রোরিঅ্যাক্টর চলতে থাকে। চৌদ্দ বছরের জন্য সঞ্চিত শক্তি নিঃশেষে ঢেলে দেয়াও হচ্ছে মহাকাশযানে... কম্পিউটারে নতুন প্রোগ্রাম ফিট করে ক্যাপ্টেন ক্লান্ত পায়ে নিজের বাসস্থানটি একবার ঘুরে দেখলেন। গ্রিনহাউসের স্বচ্ছ ছাদের ওপাশে অযুত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। ওই অগুনতি নক্ষত্র পেরিয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে মহাকাশযান পোলাস।

দেরি হয়ে গেছে জানি, তবু ডাইরেক্টরের সাথে দেখা করলাম আমি। আমার মনে আছে তিনি আমাকে ক্যাপ্টেন জারুবিনের আঁকা অন্যান্য ছবির কথা বলেছিলেন।

নিজের চেয়ারে বসে আছেন ডাইরেক্টর।

'আসুন, আসুন, আপনার অপেক্ষায়ই ছিলাম', চশমাটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললেন, 'পাশের ঘরে চলুন।'

ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ঝলমল করছে পাশের কামরা। দুটো মাঝারি আকারে ছবি ঝুলছে দেয়ালে। ছবি দুটো দেখে প্রথমে আমার মনে হল কোথাও একটা ভুল করছেন ডাইরেক্টর। জারুবিন এ ছবি আঁকতে পারেন। সকালে দেখা

ছবির মতোই মামুলি। রং নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই, নেই কোনো বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব। সাধারণ মাপের দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটিতে রাস্তা আর গাছপালা আঁকা, অন্যটিতে জঙ্গলের প্রান্তরেখা।

'হ্যাঁ, জারুবিনের আঁকা ছবি ওগুলো', যেন আমার ভাবনাটা ধরতে পেরেই বললেন ডাইরেক্টর। 'আপনি ইতোমধ্যে জেনে গেছেন যে, ওই গ্রহে রয়ে গিয়েছিলেন তিনি একা। তাঁর এ সিদ্ধান্ত আত্মহত্যারই শামিল, তবুও অন্যদের বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কথাগুলো একজন প্রাক্তন মহাকাশচারী হিসেবে বলছি কিন্তু', চোখে চশমা লাগালেন তিনি। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'ওরা চলে আসার পর জারুবিন একা একা কী করছিলেন তা রিপোর্ট পড়ে জেনেছেন আপনি। চার সপ্তাহ ধরে তিনি মহাকাশযান পোলাসকে চৌদ্দ বছরের জন্য সঞ্চিত শক্তি সররবাহ করে গেছেন। গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের শক্তি ফিরিয়ে এনে মহাকাশযান পোলাসকে ঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। মহাকাশযানের গতি আলোর গতির কাছাকাছি আসার পর জি-লোড স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এরপরে অভিযাত্রীরা মহাকাশযানটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। ততদিনে জারুবিনের মাইক্রোরিঅ্যাক্টরের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। তখন আর কিছুই করার ছিল না... সেই সময় জারুবিনের মাইক্রোরিঅ্যাক্টরের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। তখন আর কিছুই করার ছিল না... সেই সময় জারুবিন এই ছবিগুলো আঁকতে শুরু করেন। ছবিগুলোয় পৃথিবী আর এখানকার জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছ...'

গ্রামের কোনো পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে বহুদূর। বুনো গাছ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। কাছেই একটি ওক গাছ। আকাশে ভেসে যাচ্ছে ছোট ছোট সাদা মেঘ। একটি গর্তের ধারে পড়ে আছে বিশাল এক পাথর। যেন খানিক আগেও ক্লান্ত কোনো পথিক ওটার ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল... ছবির প্রতিটি অংশ নিখুঁতভাবে আঁকা-অসম্ভব যত্ন এবং মমতার ছায়া স্পষ্ট হয়েছে। আলো এবং আঁধারের অপূর্ব সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে ছবিতে।

অন্য ছবিটি অসমাপ্ত। বসন্তকালের অরণ্যের দৃশ্য ওটা। আলো, বাতাস এবং উষ্ণতাকে অনুভব করা যায় ছবিটি দেখে... সোনালি রঙের খেলা ছবিতে... জারুবিন রঙের যাদুকর।

'ছবিগুলো আমি পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি', হালকা গলায় ডাইরেক্টর বললেন।

'আপনি?'

'হ্যাঁ।' ব্যগ্র কণ্ঠে কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে যেসব কাগজপত্র দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়। বার্নাডের তারায় অভিযানের আরো কাগজপত্র রয়েছে। মহাকাশযান পোলাস ফিরে আসার সাথে সাথেই একটি উদ্ধারকারী মহাকাশযান পাঠান হয় বার্নাডের তারায়। ওটার যাত্রাকাল সংক্ষিপ্ত করার জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নেয়া হয়। অভিযাত্রী দল জি-সিক্স-এর নিচে মহাকাশযান চালাতে হয়েছিল। গ্রহে ওরা নেমেছিল কিন্তু গ্রিনহাউসটি খুঁজে পায় নি। জারুবিনকে উদ্ধারের জন্য ওরা প্রচণ্ড ঝুঁকি নেয়, কিন্তু ফিরে আসে খালি হাতে।'

'তারপর–বহু বছর পর–'

'আমাকে পাঠান হয়। এবার আমরা সেই বাড়িটাকে খুঁজে পাই। ছবিগুলো সেখানেই পাই...ক্যাপ্টেন জারুবিনের হাতে লেখা একটা চিরকুটও ছিল।'

'কী লেখা ছিল তাতে?'

মাত্র একটা লাইন : 'ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলেও এগিয়ে চল।'

ছবিগুলোর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম আমরা। ক্যাপ্টেন জারুবিন ছবিগুলো এঁকেছিলেন স্মৃতি থেকে। তাঁর চারপাশে ছিল বরফের রাজত্ব। বার্নাডের তারার লাল আলো মিটমিট করে জ্বলে আকাশে। এমন এক ম্লান পরিবেশে জারুবিন উজ্জ্বল রং নিয়ে খেলা করেছেন... টুয়েলভথ ক্লজে তাঁর লেখা উচিত ছিল : আমার সকল ভালোবাসা পৃথিবীর, মানুষ আর জীবনের জন্য।

আর্কাইভের করিডর এই মুহূর্তে জনশূন্য, শান্ত। জানালা খোলা, সমুদ্রের উদ্দাম বাতাস ভেসে আসছে খোলা জানালা পথে। ভারী পরদাগুলো বাতাসের ধাক্কায় নড়ছে। ওরা যেন ফিসফিসিয়ে বলছে : ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলেও এগিয়ে চল। একটু থেমে আবার ফিসফিসিয়ে বলছে : ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত... তারপর আবার থামছে...

গুঞ্জনের জবাব দিতে ইচ্ছা করল আমার : 'হ্যাঁ এগিয়ে চল, শুধু এগিয়ে চল, সবসময়।'

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

আই র‍্যাম দ্য চার্জ হোম ইন টু দ্য ব্রীচ

আনাতোলি মেলনিকভ

প্লানেট পেনসি'র ডেলটা আউটার স্পেস পরিদর্শন প্লেন তার মিশন শেষ করেছে। স্পেসশিপে রয়েছে একমাত্র জ্যান্ত সত্ত্বা সুপার-ব্রেন আলফা 222NX। নব আবিষ্কৃত সবুজ গ্রহটিকে পরিক্রমা শেষ হয়েছে এইমাত্র। ২২২ জন আবেদনকারী থেকে তাকে এ অভিযানের জন্যে বাছাই করেছে রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টার। প্ল্যানেট পেনসির অধিকর্তাদের যথেষ্ট ভরসা রয়েছে তাদের সাহসী নভোচারীটির ওপর।

ডেলটা স্পেস প্লেনকে বলা যায় পেনসি টেকনোলজির এক আশ্চর্য আবিষ্কার। নভোযানটি দুর্দান্ত শক্তিশালী পাওয়ার প্ল্যান্ট, দারুণ সব গিয়ার আর ঝকমকে ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা সজ্জিত। আর আলফা 222NX-কে নির্বাচন করা হয়েছে এই দারুন আকর্ষণীয় গ্রহটির ওপর ঝটিকা তথ্য সংগ্রহের জন্যে। এ কাজে ডেলটা প্লেনের সময় লেগেছে এক হপ্তা। আলফা 222NX যতই গ্রহটির মহাদেশ, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী, সমভূমি-জঙ্গলের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে ততই সবুজ গ্রহটিকে ভালো লেগেছে। পরীক্ষা করে দেখেছে, প্রতিটি ভৌগলিক জোন-এর প্রাণী, সন্ধি এবং ব্যাকটেরিওলোজিক্যাল পৃথিবী।

পরীক্ষার ফলাফল মনে হয়েছে সন্তোসজনক।

নবাগত নভোচারী দ্রুত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে সেন্টার ফর রিকগনিসন ফ্লাইট-এ। কর্তৃপক্ষ গ্রহটির নাম দিয়েছেন 'নিউ পেনসি'। তাঁরা ইতোমধ্যে বিবেচনা করে দেখেছেন এই গ্রহে সহজেই একটি স্পেস জেটি স্থাপন করা সম্ভব।

তকে পেনসির নভোচারী সমস্ত রিপোর্ট পাঠাতে তখনো সমর্থ হয়নি। সে কিছু অদ্ভুত প্রাণী দেখেছে গ্রহটিতে। এদের দুটো হাত, দুটো পা। দেখে মনে হয় আদিম যুগের প্রাণী। তবে মস্তিষ্কের গঠন এত ছোট যে বোঝাই যায় এদের সভ্যতা তেমন সমৃদ্ধ নয়। কারণ এদের কৃত্রিম রেডিও-সিগন্যালের ব্যবহার জানা নেই। আর রেডিও-অ্যাকটিভ ব্যাকগ্রাউন্ডও অত্যন্ত নিম্নমানের।

পেনসির নভোচারী সবুজ গ্রহের প্রাণীদের সাথে চেষ্টা করেও কোনোভাবে যোগাযোগ করতে পারল না ওদের কাছে কোনো রকম ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন না থাকায়। গ্রহটির শহরগুলো আকারে বড় হলে কি হবে কোথাও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। এদের বড় হলে কি হবে, কোথাও পর্যাপ্ত আলো ব্যবস্থা নেই। এদের আকাশে নেই কোনো উড়োজাহাজ, শুধু উষ্ণ রক্তের কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের নড়াচড়া করার ডানা আছে।

সুপার-ব্রেন আলফা 222NX এসমস্ত রিপোর্ট সবিস্তারে পাঠিয়ে দিল রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টারে। তার রিপোর্টের শেষ কথাগুলো এরকম : অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই সভ্যতার আমাদের কসমিক ডেলটা প্লেনকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই। তবু বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে এই আদিম প্রাণীদের সামরিক সামর্থ্যের ব্যাপারে আরো তথ্য সংগ্রহ করা প্রায়োজন।

রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টারে থেকে জবাব এল : তোমার অনুসন্ধান চালিয়ে যাও।

...কসমিক ডেলটা প্লেন উড়ে এল দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত সমভুমির ওপরে। এ অঞ্চলে গ্রীষ্ম আসছে। অস্তগামী সূর্যের বিদায়ী রশ্মিতে শস্যক্ষেত জ্বলজ্বল করছে সোনার মতো। সবুজ বনানীর গাছ-গাছালির মাথা আলো মেখে হলুদ হয়ে আছে।

উপত্যকার নদী বয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সাদা কুয়াশার পর্দা জমতে শুরু করেছে নদী বলে। ... পেনসি'র স্পেস ক্রাফট উড়ে চলল আঁধারের মাঝে। আলফা 222NX-এর চোখ জ্বালা করছে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের কারণে। সে সিদ্ধান্ত নিল নিজের গ্রহের গান শুনবে কিছুক্ষণ। চালু করে দিল শক্তিশালী ডেলটা প্লেন রেডিও ইকুইপমেন্ট। সে নিশ্চিত যে এ গ্রহে কোনো রেডিও বা টেলিভিশন স্টেশন নেই। রেডিও চালু করার পরে আউটারে স্পেস থেকে ভেসে এল ভারী মিষ্টি বাজনা। ডেলটা প্লেন অন্ধকার জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, গান শুনতে শুনতে সুপার-ব্রেনের কেমন ঘুম এসে যায়...

হঠাৎ জেগে ওঠে সে চমকে গিয়ে।

<u>আই র‍্যাম দ্য চার্জ হোম ইন টু দ্য ব্রীচ</u>

পর্দায় তাকাতে সুপার-ব্রেন বুঝতে পারল আঁধার কেটে যেতে শুরু করেছে, বনভূমি পেছনে ফেলে এসেছে সে। ডেলটা প্লেন এখন উড়ে চলেছে খোলা জমিনের ওপর দিয়ে। আর এখানে কিছু একটা ঘটছে।

ভোরের আলো মাত্র ফুটি ফুটি করছে, এমন সময় খোলা জমিন আলোকিত হয়ে উঠল হাজারো অগ্নিশিখার আলোয়। গম্বুজ আকৃতির ধোঁয়ার মেঘ, কুয়াশার মতোই ঘন, উঠে আসতে লাগল শূন্যে। তার ডেলটা প্লেনের ইনস্ট্রুমেন্টের ধরা পড়ছে বিদঘুটে সব শব্দ দুম দাম ঠুসঠাস। রাডার সেটের পর্দায় বড় বড় ধাতব খণ্ডের ঝাঁক দেখা দেল।

আলফা 222NX দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে সে দেখবে কি ঘটছে এখানে। সম্ভবতঃ ঘটনাটা আদিম প্রাণীদের মিলিটারী সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সে কসমোভিশন চ্যানেল চালু করে দিল যাতে তার সাথে প্ল্যানেট পেনসি'র অধিকর্তারাও দেখতে পান কি ঘটছে এখানে।

ডেলটা প্লেন প্রায় নিঃশব্দে নেমে এল নিচে, জঙ্গলের কোনায় গাছের মগডালের ওপর ভেসে রইল মধ্যযুগের ট্রাইকনের মতো। জঙ্গলে পচাপাতা আর মাশরুমে গন্ধ। দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফার গাছের সারি যেন অদূরের গোলাবর্ষণের আওয়াজ শুনছে। ফলের ভারে মাটিতে ঝুলে পড়েছে হ্যাজেল শাখা। স্পেসশিপের অনাহূত আগমনে বিরক্ত হয়ে একদল ভীত ম্যাগপাই কাছের পাইন গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল চিৎকার করতে করতে।

সুপার-ব্রেন দেখছে তার সামনে ছোট ছোট জলধারা আর গভীর খাদ। মাঠে দাঁড়িয়ে আছে দুই হাত, দুই পা অলা আদি প্রাণীরা। তাদের গায়ে কাদা। তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। হাতের যন্ত্র দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে, ভেতরে ধাতব সিলিন্ডার ঢোকাচ্ছে। এরকম শত শত সিলিন্ডার সারা মাঠে ছড়ান ছিটান। সিলিন্ডার থেকে একটু পরপর ধোঁয়া আর আগুন বেরিয়ে আসছে।

একটু পরে সে বুঝতে পারল আসলে দুটি দল পরস্পরের সাথে মারামারি করছে। একদলে পরনে সবুজ পোশাক। অন্য দল নীল। সবুজ পোশাক পরা দলটা হঠাৎ মারমুখি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীল দলের ওপর। গোলন্দাজ বাহিনী শুরু করে দিল গোলাবর্ষণ। মোটা মোটা সিলিন্ডারগুলো বিস্ফোরিত হতে শুরু করল বিকট শব্দে। একটু পরে সাদা ধোঁয়ার মেঘে সামনের দৃশ্যটা আড়াল হয়ে গেল। সুপার-ব্রেন আরো নিচে নেমে এল প্লেন নিয়ে। কিন্তু মাঠের ধোঁয়া এবার ঢেকে ফেলল তার নভোযানকেও। সে সাথে সাথে ডিফেন্স মেকানিজমের সুইচ টিপে দিল আত্মরক্ষার জন্যে।

...গোলন্দাজ ইভান প্যান্টেলিয়েভ ভারী একটি লোহার গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। তারপর সিধে হয়ে তাকাল স্রেফ লাইনের দিকে মুখ করা প্যারাপোটের দিকে। মার্শাল ডাভুটের সৈন্যরা আক্রান্ত হয়ে বিশৃঙ্খল ভঙ্গিতে পালাতে শুরু করেছে...

ইভান ঘাড়টাকে আরো লম্বা করতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল : রাশান পজিশনের ঠিক ওপরে, শূন্যে ভেসে আছে একটি বিশাল ফ্রেক ট্রাইকন, শত্রু নোপোলিয়ান বোনোপটেরী বাহনের মতো দেখতে।

আর্টিলারী অফিসার প্রিন্স তুচকভ পাশেই দাঁড়ান ছিলেন, ইভান তাঁকে উদ্দেশ্য করে, আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলল :

'ওই যে দেখুন, ইয়োর হাইনেস! ওটা একটা ফরাসী না?'

প্রিন্স তুচকভ হাতের তেলো দিয়ে চোখ ঘষলেন। স্বপ্ন যে দেখছেন না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছেন। ট্রাইকনটা আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাথে মনে পড়ে গেল তিনি শুনেছেন শত্রুপক্ষ বেলুন দিয়ে রাশানদের ওপর নাকি বোমা ফেলার পাঁয়তারা করেছে... এখন দেখা যাচ্ছে ঠিকই শুনেছেন।

'শত্রুকে আক্রমণ করো।' সাথে সাথে আদেশ দিলেন তিনি।

ইভান আরো দু'জন গোলান্দাজসহ কামানের ব্যারেল ফিট করে ধরল ট্রাইকনের সোজাসুজি।

'ফায়ার!' গর্জে উঠলেন প্রিন্স তুচকভ।

বিটক শব্দে বিস্ফোরিত হল কামান, একই সাথে আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। বিস্ফোরণের চোটে গোলন্দাজদের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। প্যারাপোটে পড়ে গেল রীতিমত হুড়োহুড়ি। কামান ছিটকে পড়ল একপাশে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল গোটা মাঠ।

অজ্ঞান হয়ে যাবার আগ মুহূর্তে ইভান আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, যীশুর শত্রুটা এবার আমাদের ধরেছে। তার পায়ে লাল, গরম পাথর অথবা কোনো ধাতব খণ্ড হিস হিস করে ছিটকে ছুঁয়ে গেল। তারপর কালো হয়ে গেল।

... গোর্কি গ্রামের কাছে, পাহাড়ের চিফ কমান্ডার অভ দ্য রাশান আর্মি ফিল্ড মার্শাল কুটুজোভ হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন। সেখানে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে এল এক লিয়াজোঁ অফিসার। ফিল্ড মার্শালের অ্যাডজুট্যান্টকে সে সংক্ষেপে শুধু বলল: 'আর্জেন্ট রিপোর্ট টু হিজ হাইনেস ফ্রম জেনারেল নেভেরোভস্কি।'

অ্যাডজুট্যান্ট রিপোর্টসহ অফিসারকে নিয়ে চলে এল কুটুজোভের কাছে। চিফ কমান্ডার টেলিস্কোপে রেভস্কির যুদ্ধ দেখছিলেন। তিনি টেলিস্কোপ নামিয়ে রেখে জানতে চাইলেন:

'হ্যাঁ। কি খবব বল?'

স্যালুট মেরে অফিসার ফিস ফিস করে বলল : 'ইয়োর হাইনেস, হিজ এক্সেলেন্সি জেনারেল নেভারোভস্কি এক অস্বাভাবিক ঘটনার কথা বলতে বলেছেন...'

'জোরে বল!' দাবড়ে উঠলেন বৃদ্ধ জেনারেল। 'এখানে গোপন করার কিছু নেই।'

'আমাদের হামলার মুখে ফ্রেক ক্যাভালরি যখন কেটে পড়ছিল, ওই সময় আকাশ থেকে ২৭ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের গান এমপ্লেসমেন্টের ওপর টকটকে লাল এবং ভয়ানক গরম একটি স্প্লিন্টার ছিটকে পড়ে- ওটাকে বলা হয়েছে "উল্কা"।'

'আমি জানি উল্কা কি জিনিস,' আবার ধমকে উঠলেন জেনারেল। 'বলে যাও।'

'জেনারেল নেভারোভস্কি ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছ থেকে হুকুমের অপেক্ষায় আছেন!' বলল অফিসার।

'প্রিন্স দিমিত্রি পেত্রোভিচ নেভারোভস্কি কি আহত হয়েছেন?' কটমট করে অফিসারের দিকে তাকালেন ফিল্ড মার্শাল। 'তুমি এটার কথা বলোনি কেন?'

অফিসার মাথা নিচু করে ফেলল। কিছু বলল না।

কুটুজোভ এক সেকেন্ড কি যেন ভাবলেন, তারপর বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন :

'২৭ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট-এর জেনারেল নেভারোভস্কি এবং তার সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি আমার আদেশ:

'এ ঘটনার কথা ভুলে যেতে হবে। যেন এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। নয়তো কেউ কেউ আছে অশুভ লক্ষণ ভাবতে পারে। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমরাই জয়ী হব। কাজেই আমার হুকুম হল : এটার কথা ভুলে যাও। শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়েছে। আগামীকাল আমি রাশান আর্মিকে সাধারণ আক্রমনের আদেশ দেব।'

... যে মুহূর্তে ফিল্ড মাশাল কুটজোভ লিয়াজোঁ অফিসারের কাছ থেকে রিপোর্ট শুনছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে প্ল্যানেট পেনসির ডেল্টা প্লেন পৃথিবী থেকে

কেটে পড়েছে। স্পেসশিপের গায়ে রাশান গোলান্দাজ বাহিনীর ছুঁড়ে মারা গ্রেনেডের আঘাতে বড়সড় একটি গর্ত দেখা যাচ্ছিল।

পেনসি গ্রহের অধিকর্তারা আলফা 222NX-এর সাথে কসমোভিশন চ্যানেলে আদিম যুগের প্রাণীদের সামরিক যুদ্ধ দেখছিলেন অবাক হয়ে। স্পেসশিপের শক্তিশালী প্রটেক্টিভ জোন-ও তাদের অস্ত্রের হামলার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছিল না। বরং আগুনে বোমার আঘাতে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ডেল্টা প্লেন। তবে আদিম প্রাণীরা বোধহয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি।

রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টারের বিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের সিদ্ধান্ত পৌছুলেন : পেনসি গ্রহের ডেলটা প্লেনের কোনো প্রয়োজন নেই আদিম প্রাণীদের যুদ্ধের মধ্যে জাড়িয়ে পড়ার।

আলফা 222NX- কে তক্ষুনি ফিরে আসার আদেশ দেয়া হল।

অনুবাদ ঃ অপু রায়হান

ক্র্যাবস্ অন দ্য আইল্যান্ড

আনাতোলি ড্নেপ্রভ

'শোনো! সাবধানে নামাও!' চেঁচিয়ে জাহাজের নাবিকদের বলল কুকলিং। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে একটা কাঠের পেটি নামাচ্ছিল ওরা নৌকা থেকে। দশটা কাঠের পেটির শেষ পেটিটাও নামান হচ্ছে দ্বীপে।

'ইস! কী গরম! নরক যেন', গরমে অতিষ্ঠ হয়ে বলল সে। রুমাল দিয়ে বারবার ঘাড় মুছছে। এবার গায়ের জামাটা খুলে বালির ওপর ছুড়ে ফেলল। 'তুমিও জামা, কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে পার, বাড। এখানে কোনো মানুষের বাস নেই,' বলল আবার।

মনমরা হয়ে হালকা পাল তোলা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। তীরের মাইলখানেক কিংবা তারও বেশি দূরে নীল সাগরের পানিতে মৃদুভাবে দুলছিল জাহাজটা। তিন সপ্তাহ পরে জাহাজটা আবার আসবে আমাদের নিয়ে যেতে।

'হতচ্ছাড়া এই পোড়া দ্বীপে এতসব যন্ত্রপাতি এনেছ কেন?' জামা খুলতে খুলতে কুকলিংকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'সূর্য যা তাপ ছড়াচ্ছে তাতে আগামীকালই এক একটা ছাল ছাড়ান শশা হয়ে যেতে হবে আমাদের নির্ঘাত।'

'ক্ষেপছ কেন? সূর্যের তাপ আর আলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে। দুপুর বলে এখনো মাথার ওপর রয়েছে সূর্যটা। তাই একটু গরম লাগছে।'

'বিষুবীর অঞ্চলে সবসময়ই এমন গরম পড়ে। ভূগোল বইয়ে এ ব্যাপারে স্পষ্ট লেখা আছে।' বিড়বিড় করে বললাম আমি। 'ডোভ'-এর ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরালাম না। ডোভ আমাদের নিয়ে আসা জাহাজটির নাম।

নাবিকেরা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। বিজ্ঞানী কুকলিং-এর পাশে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কুকলিং ধীরে ধীরে প্যান্টের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল।

'চলবে?' নাবিকদের টাকা ভাগ করার সময় জিজ্ঞেস করল। নাবিকদের একজন মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল।

'তা হলে এবার জাহাজের ফিরে যাও। ক্যাপ্টেন গ্যেলকে বলবে দিন বিশেক পর যেন আমার ফিরে আসে। আমরা অপেক্ষায় থাকব।'

এবার আমার দিকে ফিরে কুকলিং বলল, 'এখনই কাজে নামতে হবে আমাদের, বাড। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'সত্যি বলতে কি কেন এখানে এসেছি সেইটাই আমি জানি না এখনো। নৌ সচিবের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাকে জানানোয় অসুবিধা ছিল হয়তো। কিন্তু এখন তো বলা যায়।'

একবার আমার দিকে তাকিয়ে, তারপর বালুর দিকে চোখ ফেরাল কুকলিং।

'তখনো বলা যেত। সবই বলতে পারতাম তোমাকে। কিন্তু হাতে মোটেও সময় ছিল না।'

বুঝলাম মিথ্যা বলছে কুকলিং কিন্তু কিছু বললাম না আমি। কুকলিং তার তামাটে ঘাড় ঘামে ভেজা আঠাল হাতে রগড়াচ্ছে। মিথ্যা বলার সময় এমন করে থাকে সে। এখন যে মিথ্যা বলছে সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

'শোনো বাড, খুব জরুরি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছি আমরা সেই থিওরিটা পরীক্ষা করার জন্য... কী যেন নাম...?' ইতস্তত করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে।

'কার?'

'ওই যে ইংরেজ বিজ্ঞানী। দুত্তোরি ছাই নামটাই ভুলে গিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে– চার্লস ডারউইন।'

আমি সামনে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম। রাগে সারা শরীর কাঁপছে আমার।

'দেখ কুকলিং। তুমি হয়তো ভাবতে পার আমার মাথাটা গরুর বিষ্ঠায় ভরা, আমি ডারউইনকে চিনি না! মিথ্যে না বলে এবার সোজা কথায় এস তো, কেন উত্তপ্ত ছোট এই দ্বীপে এসেছি আমরা? আর হ্যাঁ ডারউইনের নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবে না।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কুকলিং। হাসির চোটে তার সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কয়েক কদম পেছনে গিয়ে বলল, 'তুমি একটা গাধা, বাড। আগাগোড়াই তাই ছিলে। আমরা এখানে এসেছি ডারউইনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য।'

'সে জন্যই বুঝি পুরোন লোহাভর্তি দশটা কাঠের পেটি এনেছ?' আমি আর একটু সামনে এসে জানতে চাইলাম।মোটা ঘর্মাক্ত লোকটার প্রতি আমার ঘৃণা যেন আকাশ স্পর্শ করল।

'হ্যাঁ', বলল সে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে তার। 'তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এক নম্বর পেটি খুলে তাঁবু, পানি, ক্যান্ড ফুড আর অন্য পেটিগুলো খোলার যন্ত্রপাতি বের করা।'

কুকলিং-এর সাথে প্রথম আলাপের সময়ের মতোই গম্ভীর গলায় এখন কথা বলছে সে। ওর সঙ্গে আর্মি ফায়ারিং গ্রাউন্ডে দেখা হয়েছিল আমার। দুজনের পরনেই আর্মি ইউনিফর্ম ছিল।

'বেশ, ঠিক আছে', বিড়বিড় করে বলতে বলতে এক নম্বর পেটির দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

দু'ঘন্টার মধ্যে বালির ওপর তাঁবু টাঙান হয়ে গেল আমাদের। কোদাল, শাবল, বাটালিসহ নানা রকম স্ক্রু ড্রাইভার রাখা হল তাঁবুর একপাশে। আর একপাশে থরে থরে সাজিয়ে রাখলাম নানা জাতের অগুনতি ক্যান্ড ফুড আর পানির বোতল।

দলপতি বলে ষাঁড়ের মতো খাটছে কুকলিং। আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে 'ডোভ' কখন নোঙর তুলে দিগন্তে হারিয়ে গেছে টের পাই নি।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে দুই নম্বর পেটি নিয়ে পড়লাম আমরা। ওটা থেকে বের হল একটা দুই চাকার ঠেলাগাড়ি, সাধারণত রেলস্টেশনে দেখা যায় এখনো।

তৃতীয় পেটিটা খুলতে যেতেই কুকলিং আমাকে বাধা দিল।

'আগে ম্যাপটা দেখে নিই। দ্বীপের বিভিন্ন অংশে জিনিসগুলো রেখে আসতে হবে আমাদের।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে এসব করতেই হবে', বলল সে।

দ্বীপটা গোলাকৃতি, ঠিক যেন একটা উল্টান প্লেট। উত্তরদিকে রয়েছে একটা ছোট উপসাগর—আমরা এসে নেমেছি যেখানে। চারদিকে পঞ্চাশ গজ

পরিধি নিয়ে বালুর সৈকত। তীর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে নিচু উপত্যকা। এক ধরনের গুল্মে ঢাকা। সূর্যের তাপে শুকিয়ে ঝলসে গেছে গুল্মগুলো।

দ্বীপের ব্যাস দুই মাইলের বেশি হবে না।

ম্যাপটির নানা জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়া আছে—কিছু দাগ তীরে, আবার কিছু দ্বীপের ভেতরের বিভিন্ন অংশে।

'পেটিগুলো খুলে বের করা জিনিসগুলো দাগ দেয়া জায়গায় রেখে আসতে হবে', কুকলিং বলল।

'ওগুলো কি মাপজোখের যন্ত্রপাতি?'

'না', চাপা হাসি হেসে বলল কুকলিং। বিশ্রী একটা স্বভাব আছে ওর, যখন দেখে একটা কথা সে বাদে আর কেউ জানে না তখন এভাবে হাসে সে।

তৃতীয় পেটিটা বেশ ভারী। মনে হয় ভেতরে বড় ধরনের কোনো যন্ত্র আছে। কিন্তু কাঠের তক্তা খোলার পর বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। নানা আকারের লোহার বার আর টুকুরোয় ভর্তি ওটা।

'তুমি কি ভেবেছ এসব নিয়ে খেলা করব আমরা', চিৎকার করে বললাম আমি। পেটি থেকে আয়তক্ষেত্রাকার, গোল, চৌকো ধাতুখণ্ড বের করলাম।

'মোটেই না', কুকলিং জবাব দিল। চার নম্বর বাক্সটা খোলার জন্য এগিয়ে গেল সে। চার নম্বর থেকে শুরু করে নয় নম্বর পেটি সবকটা একই রকম ধাতুখণ্ডে বোঝাই।

তিন রকম ধাতুখণ্ড রয়েছে–ধূসর, লাল আর রুপালি। আমি অনায়াসে বলতে পারি ওগুলো লোহা, তামা আর দস্তা।

শেষ পেটিটা খুলতে যেতেই কুকলিং বলল, 'ধাতুপিণ্ডগুলো দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় রেখে তারপর খুলব ওটা।'

একটানা তিন দিন ঠেলাগাড়িতে করে ধাতুপিণ্ডগুলো দ্বীপের বিভিন্ন অংশে রেখে আসলাম। কোথাও স্তূপ করে রাখা হল আবার কোথাও বালুর ওপর ছড়িয়ে দেয়া হল। কিছু কিছু ধাতুপিণ্ড আবার কুকলিং-এর হুকুমিমাফিক বালির নিচেও পুঁতে রাখলাম। কয়েকটা স্তূপে তিনটিধাতুর সংমিশ্রণ রাখা হলেও কোনোটাতে কেবল একটা ধাতু থাকল। ঠিকঠাক কাজ হবার পর আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম দশম পেটি খোলার জন্য।

'এবার খোলো ওটা', আদশের সুরে বলল কুকলিং, 'তবে সাবধান।'

অন্যান্য পেটির চাইতে এ পেটিটা বেশ ছোট আর হালকা। কাঠের গুঁড়ো দিয়ে প্যাক করা হয়েছে। তবে কাঠের গুঁড়োর নিচে রয়েছে ফেল্ট এবং অয়েল

পেপারের আচ্ছাদন। মোড়কটা খুলতেই একটা অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র বেরিয়ে এল।

প্রথম দর্শনে মনে হল কাঁকড়া জাতীয় ছোটদের ধাতব কোনো খেলনা। কিন্তু সাধারণ কাঁকড়া নয় ওটা। এটার রয়েছে ছয়টি তীক্ষ্ণ সাঁড়াশি সদৃশ দাঁড়া। এ ছাড়াও একজোড়া বড় পা আর দুজোড়া শুঁড়। কুৎসিতদর্শন জীবটার ঠেলে বেরিয়ে আসা 'মুখে'র সঙ্গে লেগে আছে শুঁড়গুলোর মাথা। পিঠটা ঈষৎ টোল খাওয়া। পিঠের উপর ঝকঝকে ধাতব আয়না দেখা যাচ্ছে, যার কেন্দ্রে আছে কালচে লাল একখণ্ড ক্রিস্টাল সামনে পেছনে রয়েছে দু জোড়া চোখ। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি আজব বস্তুটির দিকে।

'পছন্দ হয়েছে?' দীর্ঘ নীরবতার পর কুকলিং প্রশ্ন কলল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'দেখে তো মনে হচ্ছে বাচ্চাদের খেলনা নিয়ে খেলতে এসেছি আমরা।'

'খুবই বিপজ্জনক খেলনা', আত্মতৃপ্তির সাথে বলুন কুকলিং। 'শিগগিরই দেখতে পাবে। ওটাকে বালির ওপর রাখ।'

কাঁকড়াটা হালকা। দশ পাউন্ডের বেশি হবে না।

'এরপর', আমি বিদ্রুপের সুরে জিজ্ঞেস করলাম কুকলিংকে।

'ওটা গরম না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

আমরা এই ক্ষুদে দানবটার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। কয়েক মিনিট বাদে দেখলাম, কাঁকড়ার পিঠের আয়নাটা সূর্যের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।

'এ কি, ওটা জীবন্ত হয়ে উঠছে!' আমি উত্তজনায় উঠে দাঁড়ালাম।

উঠে দাঁড়াতেই আমার ছায়া পড়ল মেশিনটার ওপর। কাঁকড়ার পা সক্রিয় হয়ে নড়তে শুরু করল এবং সুর্যের আলোয় গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমি এত ভয় পেলাম যে এক লাফে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম।

কুকলিং অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'তোমার খেলনার খেল দেখলে! ভয় পাইয়ে দিয়েছে তোমাকে তাই না?' কপালের ঘাম মুছলাম আমি।

'ঈশ্বরের দোহাই, কুকলিং এটা নিয়ে কী করব আমরা, বলবে?'

ওঠে দাঁড়াল সে। আমার কাছে এসে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'ডারউইনের থিওরি পরীক্ষা।'

'ওটা তো জীববিদ্যার থিওরি, বিবর্তনের থিওরি, আর ...' বিড়বিড় করে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, তা ঠিক ওই দেখ আমাদের হিরো পানি খেতে যাচ্ছে।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। খেলনা কাঁকড়া বুকে হেঁটে পানির কাছে চলে গেছে। শুঁড় দিয়ে পানি পান করছে। পানি খেয়ে বুকে হেঁটে ফিরে এল আবার সূর্যের আলোয় এবং নিশ্চল হয়ে গেল।

ছোট্ট যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে ভয় মেশান বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হল ওটা কাঁকড়া নয়—কুকলিং স্বয়ং।

'তোমার আবিষ্কার?' একটু পর বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হুঁ', বালির ওপর শুতে শুতে বলল কুকলিং। আমিও বালিতে শুয়ে নীরবে বিস্ময়কর যন্ত্রটা দেখতে লাগলাম।

বুকে হেঁটে এবার কাঁকড়াটির দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

কাঁকড়ার পিঠটার বর্ণনা এভাবে দেয়া যায়, অর্ধনলাকৃতি, সামনে পেছনে ঈষৎ চাপা, সমতল। দুই পাশে রয়েছে দুটো অক্ষিকোটর। চোখের উজ্জ্বল স্ফটিক স্পষ্ট দেখা যায়। পেটটা তার একদম সমতল। এই অংশের ঠিক ওপরে রয়েছে তিন জোড়া সন্ধিওয়ালা সাঁড়াশির মতো পা আর দু জোড়া ক্ষুদে শুঁড়। কাঁকড়ার ভেতরটা দেখা সম্ভব হল না আমার পক্ষে।

খেলনাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে প্রশ্ন জাগল নৌ সচিব কেন এটাকে এত গুরুত্ব দিতে গেলেন? কেন বিশেষ জাহাজে এই অভিযানে আসতে সাহায্য করলেন?

কুকলিং আর আমি সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়া পর্যন্ত শুয়ে থাকলাম। ঝোপঝাড়ের ছায়া এসে পড়ল কাঁকড়ার গায়ে। ছায়া ছেড়ে সূর্যের আলোয় ওটা হেঁটে গেল। আবার ছায়া পড়ল ওটার গায়ে এবং আবার পানির কিনারার দিকে এগিয়ে গেল কাঁকড়াটা, তখনো সূর্যরশ্মি ছিল সেখানে। বুঝলাম কাঁকড়াটার জন্য সূর্যের আলো অপরিহার্য।

বালুর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমরা। ধীরে ধীরে কাঁকড়াটিকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

এইভাবে দ্বীপটিকে বৃত্তাকারে ঘুরে পশ্চিম তীরে চলে এলাম।

এখানে পানির কাছে ধাতুর একটা স্তূপ রয়েছে। কাঁকড়াটি স্তূপ থেকে দশ পা দূরে যাবার পরই অসম্ভব দ্রুত ছুটে গেল স্তূপের দিকে। সূর্য আর রোদের কথা ভুলে গিয়ে তামার বারের কাছে গিয়ে থামল।

কুকলিং আমার হাত ধরে বলল, 'চল এবার তাঁবুতে ফেরা যাক। কাল সকালে আরো দারুণ কিছু দেখতে পাব আশা করছি।'

তাঁবুতে ফিরে নীরবে রাতের খাবার খেলাম আমরা। কোনো কথা বললাম না দুজনের কেউ। খাওয়া সেরে পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কেন যেন আমার মনে হল আমি কোনো প্রশ্ন না করায় কুকলিং খুব খুশি হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি শুনলাম কুকলিং তার বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে আর চাপা হাসছে। এর মানে এমন কিছু ও জানে যা আর কেউ জানে না।

পরদিন খুব ভোরে গোসল করতে সাগরে গেলাম আমি। সমুদ্রের পানি উষ্ণ। অনেকক্ষণ ধরে গোসল করলাম। পূর্ব দিগন্তে টকটকে লাল আভা ছড়িয়ে সূর্য উঠছিল। অনেকক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য দেখলাম আমি। তাঁবুতে ফিরে দেখলাম বিজ্ঞানী নেই।

'যন্ত্রদানব দেখতে গেছে নিশ্চয়ই', আমি ভাবলাম। একটা আনারসের টিন খুললাম।

গোটা তিনেক টুকরো সবে মুখে দিয়েছি ঠিক তখনই দূর থেকে ভেসে আসা কুকলিং-এর গলা শুনতে পেলাম। 'লেফটেনান্ট, শিগগির এস!' চিৎকার করে বলছে সে। 'শুরু হয়ে গেছে জলদি এস!'

তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। দেখি কুকলিং টিলার ওপর ঝোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

'এস', বলল সে। স্টিম ইঞ্জিনের মতো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। 'তাড়াতাড়ি!'

'কোথায়?'

'গতকাল যেখানে সুন্দর যন্ত্রদানবকে রেখে এসেছিলাম।'

সূর্য তখন বেশ খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। পুরোটা পথ দৌড়াতে দৌড়াতে ধাতুস্তূপের কাছে হাজির হলাম আমরা। পিণ্ডগুলো সূর্যের আলোয় এমন ঝলমল করছিল যে প্রথমে কিছু বুঝতে পারলাম না।

ধাতুস্তূপ থেকে কয়েক পা দূরে থাকতে নজরে পড়ল দুটো নীলচে ধোঁয়ার রেখা–থমকে দাঁড়ালাম আমি। চোখ কচলে তাকালাম, না ভৌতিক কিছু দেখছি না। ধাতুস্তূপের কাছে এক জোড়া কাঁকড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক গতকালকের কাঁকড়াটার মতো।

'ধাতুস্তূপের ভেতর আরেকটি খেলনা রেখে গিয়েছিলে নাকি?' আমি চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

এক হাত দিয়ে অন্য হাত রগড়াতে রগড়াতে হাসতে লাগল কুকলিং।

'আমাকে আর রাগিও না!' চেঁচিয়ে বললাম আমি, 'দ্বিতীয় কাঁকড়াটা এল কোথা থেকে?'

'পয়দা হয়েছে গত রাতে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলাম কাঁকড়াগুলোর দিকে। ওদের পিঠের ওপর দিয়ে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখা বের হচ্ছে। প্রথমে আমার মনে হল আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে বুঝি। দুটো কাঁকড়াই ব্যস্ত। জটিল কাজে ব্যস্ত।

কাজ করে যাচ্ছে ওরা আর ওদের সামনের শুঁড়গুলো দ্রুতলয়ে ওঠানামা করছে। শুঁড়গুলো ধাতুপিণ্ড স্পর্শ করা মাত্র পিঠের ওপর বৈদ্যুতিক ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। যেন ওয়েলডিং করা হচ্ছে। ধাতুর দণ্ড কাটছে ওরা। তারপর বিরাট মুখ গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে ধাতুর টুকরো। যন্ত্রদানবের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অস্পষ্ট গুমগুম শব্দ। হঠাৎ ওদের মুখ গহ্বর থেকে হিসহিসিয়ে বেরিয়ে এল একটা আগুনের ঝলক। তারপর দ্বিতীয় শুঁড়জোড়া টেনে বের করে আনল কাঁকড়ার শরীরের বিভিন্ন অংশ।

কাঁকড়ার পেটের তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা সমতল ধাতব পাত। সেটার ওপর দেহের বিভিন্ন অংশ সাজিয়ে ফেলল নির্ভুলভাবে।

তিন নম্বর কাঁকড়াটা প্রায় তৈরি। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'এই কুৎসিত যন্ত্রটা নিজের আদলে অন্যদের তৈরি করছে?' অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক। ওটা নিজের আদলে আরেকটি যন্ত্র বানাতে পারে,' কুকলিং বলল।

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?' জিজ্ঞেস করলাম বোকার মতো।

'কেন অসম্ভব? একটা লেদ মেশিন এটার মতোই লেদের অংশ তৈরি করে না? ধারণাটা সেখান থেকেই আমার মাথায় এসেছিল। আমার যন্ত্র নিজের আদলে যন্ত্রাংশ তৈরি করতে পারবে। ওই কাঁকড়াটা তেমনি একটা মডেল।'

বিজ্ঞানীর কথা শুনে আমি ভাবনায় ডুবে গেলাম। তখনই প্রথম কাঁকড়ার মুখ থেকে রিবনের মতো ধাতব ফিতা বেরিয়ে এল। ধাতুর পাতের ওপর সাজান যন্ত্রাংশগুলোকে জড়িয়ে দিল সেটা। তৃতীয় কাঁকড়ার পিঠ তৈরি হয়ে গেল। তৈরি হল পা আর শুঁড়। পিঠের ওপর ধাতব আয়নার মাঝে শোভা পেল লাল ক্রিস্টাল।

পিঠের আয়নাটা ধীরে ধীরে সূর্যের দিকে ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় কাঁকড়াটা হামা দিয়ে পানির কিনারায় গিয়ে পানি খেল। তারপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল রোদে।

আমি স্বপ্ন দেখছি বলে মনে হল।

নবজাত কাঁকড়ার দিকে যখন তাকালাম, শুনলাম কুকলিং চলছে, 'চতুর্থটা জন্মাল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম চতুর্থ কাঁকড়াটা জন্ম নিয়েছে। ওদিকে প্রথম আর দ্বিতীয় কাঁকড়া একতালে কাজ করে চলেছে। ধাতু টুকরো করে মুখে ঢোকাচ্ছে–আগের মতো একই কাজ করছে তারা।

চতুর্থ কাঁকড়াও পানি পান করতে সাগরে গেল।

'এত পানি খাচ্ছে কেন ওরা?' জানতে চাইলাম।

'ওরা ব্যাটারি চার্জ করছে। আকাশে যতক্ষণ সূর্য থাকে ততক্ষণ কাঁকড়ার পিঠের আয়না আর সিলিকন ব্যাটারি সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। দিনের বেলা কাজ করার জন্য এই শক্তি যথেষ্ট। ওদের ভেতর বিদ্যুৎ সঞ্চয় করার জন্য অ্যাকুমুলেটর আছে, সেটাকেও চার্জ করে নেয়। রবোটগুলো অ্যাকুমুলেটর থেকে শক্তি পায়।'

'তার মানে এগুলো দিনরাত কাজ করে?'

'হ্যাঁ, রাত দিন বিরামহীন কাজ করে।'

তৃতীয় কাঁকড়া এবার ধাতুস্তূপে এগিয়ে গেল। তিনটি রোবট কাজ শুরু করে দিয়েছে এখন। আর চতুর্থটা সৌরশক্তি থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে।

'কিন্তু সিলিকন ব্যাটারির কোনো উপাদান তো এই ধাতুস্তূপে নেই', আমি বললাম। দানবগুলোর যন্ত্রাংশ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করলাম।

'তার দরকারও নেই। এখানে প্রচুর আছে সেটা', বালুতে একটা লাথি মেরে বলল কুকলিং। 'বালুতে সিলিকন অক্সাইড থাকে, কাঁকড়ার বিদ্যুৎ শক্তিতে তা বিশুদ্ধ সিলিকনের রূপান্তরিত হয়।'

সন্ধ্যার দিকে তাঁবুতে ফিরে এলাম যখন ছয়টি কাঁকড়া কাজ করে চলেছে তখন ধাতুস্তূপের মাঝে এবং দুটো নিজেদের উত্তপ্ত করছে সূর্যের আলোয়।

'এদের কী কাজে লাগবে?' রাতের খাবারের সময় কুকলিংকে জিজ্ঞেস করলাম।

'যুদ্ধে। ধ্বংস করার বেলায় ওদের চেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার আর হয় না', নীরস গলায় বলল সে।

'বুঝলাম না।'

মাংসের টুকরো চিবুতে চিবুতে কুকলিং বলল, 'এগুলো যদি গোপনে শত্রুদেশে পাচার করা যায় তা হলে কী ঘটবে একবার ভেবে দেখ।'

'তারপর?' খাওয়া বন্ধ করে বললাম।

'তুমি ক্রমবৃদ্ধির মানে তো বোঝ?'

'অবশ্যই।'

'গতকাল একটা কাঁকড়া দিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম আমরা। এখন আটটায় দাঁড়িয়েছে। আগামীকাল হবে চৌষট্টিটা, তারপর দিন পাঁচ শ বারো। দশ দিনের মাথায় ওদের সংখ্যা দশ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাব। ওদের জন্য তখন প্রয়োজন হবে তিরিশ হাজার টন ধাতু।'

ওর কথা শুনে বোবা হয়ে গেলাম আমি।

'কিন্তু..?'

'অল্প সময়ে কাঁকড়াগুলো শত্রুপক্ষের সব ধাতু হজম করে ফেলবে–ট্যাংক, বন্দুক, প্লেনের মেশিন, যন্ত্রাংশ সব ওদের পেটে যাবে। এক মাস পর পৃথিবীতে আর ধাতু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাঁকড়া তৈরির পেছনে ধাতু শেষ হয়ে যাবে। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে যুদ্ধের সময় সব ধাতুই মূল্যবান।'

'সেই জন্যই বুঝি নৌ সচিব তোমার এই খেলনার ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখিয়েছেন।' ফিসফিস করে বললাম আমি।

'ঠিক। কিন্তু এটা প্রথম মডেল। এর আরো উন্নতি সাধন আমি করব যাতে কাঁকড়া তৈরিতে আরো দ্রুততা আসবে। একই সঙ্গে তিনটি কাঁকড়া তৈরি হবে। কাঁকড়ার শরীরের গঠন আরো শক্ত আর মজবুত হবে। আরো দ্রুত চলাফেরা করবে ওগুলো। ধাতু সম্পর্কে আরো স্পর্শকাতর হবে। তারপর যুদ্ধের সময় আমার রোবট প্লেগের চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। আমার উদ্দেশ্য, শত্রুপক্ষকে দুই তিন দিনের মধ্যে ধাতু থেকে বঞ্চিত করা।'

'বুঝলাম, কিন্তু শত্রুপক্ষের সকল ধাতু শেষ করে ওরা যখন দেশের দিকে ফিরে আসবে তখন?' প্রায় চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। সেটাও ভেবেছি। ওদের কাজ কোডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করব আমরা। শত্রুপক্ষের দেশ শেষ করে আমাদের দেশে ফিরে আসার পর সংকেতের মাধ্যমে ওদের থামিয়ে দেয়া হবে। একটা জিনিস মনে রেখ এতে কিন্তু শত্রুপক্ষের সকল ধাতুর দখল চলে আসবে আমদের হাতে।'

সে রাতে আর ঘুমাতে পারলাম না আমি। রাতভর দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ধাতুর তৈরি কাঁকড়া আমার শরীর ঢেকে ফেলেছে। ওদের ধাতুর শরীর থেকে নীলচে আলো বের হচ্ছে।

চার দিনের মধ্যে কুকলিং-এর কাঁকড়ায় পুরো দ্বীপ ছেয়ে গেল।

ওদের সংখ্যা দাঁড়াল চার হাজারেরও বেশি। যত্রতত্র উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় পড়ে থাকতে দেখা গেল ওদের। একটা ধাতুস্তূপ শেষ হওয়া মাত্র সারা দ্বীপ চষে ফেলতে লাগল অন্য ধাতুস্তূপের খোঁজে।

পঞ্চম দিন সূর্যাস্তের আগে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ল : এক টুকরো দস্তার মালিকানা নিয়ে লড়াই করছে দুটো কাঁকড়া।

দ্বীপের দক্ষিণে কিছু দস্তার বার বালির নিচে পুঁতে রেখেছিলাম আমরা। দ্বীপের অন্য অংশ কর্মরত কোনো কোনো কাঁকড়া দস্তার খোঁজে এদিকটায় আসত। তাই দস্তার খোঁজ পেলে একাধিক কাঁকড়া ছুটে যেত দস্তার ওপর দখল কায়েম করার জন্য। দুটো কাঁকড়া জীবন মরণ লড়াই চালিয়ে গেল। একটা কাঁকড়া বেশ চটপটে। কেন যেন আমার মনে হল এটা অন্যটার চেয়ে শক্তিমান।

একটি কাঁকড়া অন্যগুলোকে ঠেলে সরিয়ে ওদের পিঠে চেপে বসল। ছিনিয়ে নিল ধাতুর টুকরোটা। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজের কাছে রাখতে পারল না। অন্য কাঁকড়া এসে সাঁড়াশি পা দিয়ে ছিনিয়ে নিল। এ দুটো যন্ত্র দস্তার টুকরোটাকে দু'দিকে টানতে লাগল। চটপটে কাঁকড়াটা অন্য কাঁকড়া থেকে টুকরোটা ছিনিয়ে নিল। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কাঁকড়াটা পেছন থেকে চড়ে বসল শক্তিশালী কাঁকড়ার পিঠে। কাঁকড়ার মুখে ঢুকিয়ে দিল সাঁড়াশি পা।

অন্য কাঁকড়াগুলোর এই মরণপণ লড়াইয়ের দিকে কোনো খেয়াল নেই। লড়ে চলল কাঁকড়া দুটো। জীবন মরণ লড়াই। দেখলাম অন্য কাঁকড়ার পিঠে ওঠা সেই কাঁকড়া হঠাৎ পড়ে গেল। চিৎ হয়ে পড়ামাত্র যন্ত্রাংশ আটকে রাখার ধাতব পাত সরে গেল, ভেতরের যন্ত্রাংশ বেরিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণকারী তার দেহের যন্ত্রাংশ কেটে ফেলল দ্রুত। বিচ্ছুরিত হতে লাগল বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ। কাঁকড়াটির দেহ টকুরো টুকরো হয়ে গেলে বিজয়ী কাঁকড়া সেই ধাতুর তৈরি লিভার, গিয়ার হুইল এবং তার আলাদা আলাদা করে নিজের মুখে ঢোকাতে শুরু করল।

পরাজিত কাঁকড়ার ধাতব পাত বারবার নড়তে লাগল। আর্বিভাব ঘটতে থাকল নতুন যন্ত্রাংশের।

কিছুক্ষণ পর সেই ধাতব পাত থেকে নতুন একটা কাঁকড়া বালুর ওপর পড়ল।

ভয়ঙ্কর দৃশ্যের বর্ণনা যখন কুকলিংকে দিলাম আমি তখন সে খুকখুক করে হাসল।

'এটাই আশা করেছিলাম', বলল সে।

'কেন?'

'তোমাকে আগেই বলেছি আমার রোবটকে আরো উন্নতি করতে চাই।'

'তাতে কী? ব্লু প্রিন্ট নিয়ে কাজ করো তা হলে। এই গৃহযুদ্ধের কী প্রয়োজন? এভাবে চললে একে অন্যকে খেতে শুরু করবে ওরা।'

'ঠিক সর্বোত্তমরাই বেঁচে থাকবে।'

একটু ভেবে আমি বললাম : 'সর্বোত্তম বলতে কী বোঝাচ্ছ? এরা তো একই রকম। যতটুকু বুঝতে পেরেছি ওরা নিজেদের মতো হুবহু জিনিসই উৎপাদন করছে।'

'কিন্তু তুমি কি মনে করেছ চিরকাল এই একই আকৃতি থাকবে? নিশ্চয়ই জান যে, একই মেশিনে তৈরি দুটো বল বেয়ারিং-এর বল এক রকম হয় না। ওগুলো তো সাধারণ জিনিস। রোবটেরা আরেকটি রোবট যখন বানাবে তখন দেখা যাবে মেশিনে উৎপাদন হলেও অরিজিন্যালটার মতো নেই আর।'

'কিন্তু আসলটির সাথে হুবহু মিল না থাকলে তো সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাহত হবে', বাধা দিয়ে আমি বললাম।

'তাতে কী? বরং আরো ভালো হবে তাতে। রোবটদের পরিত্যক্ত দেহ থেকে আরো উন্নত রোবট তৈরি হবে যেগুলোর ভেতরে আপনা থেকেই আরো ভালো যন্ত্রপাতি থাকবে, যার ফলে তাদের টিকে থাকা সহজতর হবে। এই কারণের জন্যই ব্লু প্রিন্টের কথা ভাবছি না আমি। রোবটেরা দ্বীপের সকল ধাতু সাবাড় করে নিজেদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাকে। রোবটরা একে অন্যকে গিলে খাবে এবং নতুন করে নিজেদের তৈরি করবে। এমন রোবট চাচ্ছি আমি যা একদিন জন্ম নেবে।'

সে রাতে তাঁবুর সামনে বালুতে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করলাম। কুকলিং যে গবেষণা শুরু করেছে তার পরিণতি কী? খারাপ হবে না মানবজাতির জন্য? সমুদ্রের মাঝে এই পরিত্যক্ত দ্বীপে আমরা যে ভয়াবহ রোবট তৈরি করেছি তারা রাক্ষুসে খিদে নিয়ে দুনিয়ার সব ধাতু উজাড় করে ফেলবে না?

আমি যখন বসে বসে এসব ভাবছি তখনই আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধাতুর জীবগুলো। বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে ওরা। দৌড়াদৌড়ি করার সময় ওদের শরীরের ভেতরের যন্ত্রাংশগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছিল। একটা কাঁকড়া আমাকে ধাক্কা দিল। প্রচণ্ড রাগে ওটাকে লাথি মারলাম আমি। অসহায়ভাবে

চিৎ হয়ে পড়ল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে দুটো কাঁকড়া ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার ওপর। ঘন ঘন চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠতে লাগল অন্ধকারে। নিশিষের মধ্যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল কাঁকড়াটা। এই নারকীয় দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। ছুটে গেলাম তাঁবুতে এবং টুলবক্স থেকে একটা শাবল তুলে নিলাম। কুকলিং নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

নিঃশব্দে কাঁকড়া পালের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। শাবল দিয়ে সজোরে আঘাত হানলাম। ভেবেছিলাম এতে অন্য কাঁকড়ারা ভয় পেয়ে যাবে হয়তো, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলাম না। আমার আঘাতে উল্টে পড়া কাঁকড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকিগুলো। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

আরো কয়েকবার আঘাত হানলাম আমি। তাতে স্ফুলিঙ্গ বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, দ্বীপের চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল অজস্র কাঁকড়া।

অন্ধকারে কেবল কাঁকড়ার অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ মনে হল অসম্ভব বড় কাঁকড়ার একটা ঝাঁক এসেছে, তাদের একটাকে লক্ষ্য করে শাবল চালালাম। শাবলটা পড়ল তার পিঠে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। আমাকে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক দিয়েছে শাবলটা। যেভাবেই হোক এই বড় জাতের কাঁকড়াগুলোর শরীরে ইলেকট্রিক চার্জ আছে। হঠাৎ কথাটা উদয় হল আমার মনে 'প্রতিরক্ষাই হল বিবর্তনের প্রধান উপায়'।

সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেছে আমার। একদল কাকড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম শাবলটা তোলার জন্য। বৈদ্যুতিক শকে হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা। কিন্তু কোথায় শাবল? আগুনের স্ফুলিঙ্গের ভেতর দেখলাম টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ওটা। সেই কাঁকড়াটাই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

তাঁবুতে ফিরে শুয়ে পড়লাম আমি।

গভীর ঘুম নেমে এল চোখে। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারলাম না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অনুভব করলাম ঠাণ্ডা ভারী কিছু আমার শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল। ভয়ে লাফ দিয়ে উঠলাম। একটা কাঁকড়া—প্রথমে বুঝতে পারি নি ওটা কী— কিছু বোঝার আগেই মিলিয়ে গেল তাঁবুর আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখে পড়ল উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ। ধাতুর খোঁজে শয়তান কাঁকড়াটা তাঁবুতে এসেছিল। ইলেকট্রড দিয়ে আমাদের টিন খাবারের পাত্র এবং পানি পাত্র কাটছে।

কুকলিংকে ঝাঁকি দিয়ে জাগালাম। কী ঘটেছে সব বললাম তাকে।

'সব টিন সমুদ্রের পানিতে নিয়ে রেখে এস। জলদি', আদেশের সুরে সে বলল, সব টিন নিয়ে কোমর পানিতে ডুবিয়ে রাখলাম আমি। আমাদের যন্ত্রপাতিও রাাখলাম।

পানিতে ভিজে ক্লান্ত শরীরে সারা রাত বালির ওপর বসে থাকলাম। চোখের পাতা এক করতে পারলাম না আর। দ্রুত শ্বাস ফেলছিল কুকলিং। এত কষ্টের মধ্যেও আনন্দ পাচ্ছিলাম কারণ তার এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে কুকলিং। ওকে প্রচণ্ড ঘৃণা হতে লাগল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম যেন কঠিন শাস্তি পায় ও।

দ্বীপে আসার পর কতদিন পেরিয়ে গেছে বলতে পারব না। এক চমৎকার সকালে কুকলিং ঘোষণা করল : 'সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মুহূর্ত এসেছে। দ্বীপের সব ধাতু খেয়ে শেষ করে ফেলেছে কাঁকড়াবাহিনী।'

যেসব জায়গায় ধাতুর বার টুকরো রেখে এসেছিলাম সেসব জায়গায় গিয়ে আমরা দেখলাম ফুরিয়ে গেছে সব, সমুদ্র তীর আর ঝোপের মধ্যে শূন্য গর্ত দেখা যাচ্ছে কেবল।

ধাতুর বার, বড় কাঁকড়া হয়ে সারা দ্বীপ চষে বেড়াচ্ছে। তারা এখন অসংখ্য। ওদের চলাফেরায় দ্রুততা এসেছে। মে গজ তিরিক্ষে। ওদের ব্যাটারি একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত চার্জ করা থাকলেও কোনো কাজ করে না। ওরা সমুদ্রতীরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঘুরে বেড়ায়। দৌড়ে যায় টিলার ওপরে ঝোপঝাড়ের দিকে। একে অপরকে তাড়া করে। মাঝে মধ্যে আমাদেরকেও তাড়া করছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, কুকলিং ঠিকই বলেছিল। কাঁকাড়াদের পার্থক্যটুকু বোঝা যায় সহজে। আকৃতি, দৈর্ঘ্য, কর্মক্ষমতার পার্থক্য রয়েছে ওগুলোর। কতগুলো খুব কর্মঠ, বাকিগুলো নয়। বোধহয় তাদের ভেতরের যন্ত্রাপাতির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

'এবার', কুকলিং বলল, 'নিজেদের মধ্যে লড়াই করার সময় হয়েছে ওদের।'

'তুমি নিশ্চিত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই। কোবাল্টের একটু স্বাদ পেলেই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করবে। ওদের ম্যাকানিজম এমনভাবে তৈরি, একবার কোবাল্টের সামান্যতম মিশ্রণ ঘটলেই পরস্পরের মধ্যে যে শ্রদ্ধা রয়েছে তা উধাও হয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে আমরা 'সমুদ্র ভাণ্ডার' থেকে বেশ কয়েকটা খাবার, পানির টিন এবং ছাই রঙের চারটা কোবাল্ট তুলে আনলাম। কোবাল্টের বারগুলো কুকলিং সযত্নে রেখে দিয়েছিল এক্সপেরিমেন্টের এই বিশেষ পর্যায়ের জন্য।

কেবাল্টের বারগুলো মাথার ওপর তুলে হেঁটে যাচ্ছি আমি আর কুকলিং।

অচিরেই ওকে একদল কাঁকড়া ঘিরে ধরল। ওদের লক্ষণ দেখে মনে হল নতুন ধাতুর আবির্ভাব ওদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কয়েক পা পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। কয়েকটা ধাতুর মেশিন লাফ দেবার চেষ্টা করছে। দেখে অবাক হলাম।

' দেখ, দেখ ওদের চলাফেরায় কী বৈচিত্র্য! ওদের মধ্যেকার পার্থক্য লক্ষ্য করো। যুদ্ধের পর কেবল শক্তিশালী এবং যোগ্যতররাই বেঁচে থাকবে। এখন আরো নিখুঁত হয়েছে ওরা।'

কথা বলতে বলতে কুকলিং ঝোপের মধ্যে চারটে বার ছুড়ে দিল।

পরের ঘটনার বর্ণনা দেয়া কঠিন।

এক সঙ্গে অনেকগুলো কাঁকড়া ঝাঁপিয়ে পড়ল কোবাল্ট বারের ওপর। পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি মারামারি শুরু করে দিল। একে অপরকে কাটতে শুরু করল। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল। অন্যরা নিষ্ক্রিয় থাকল না—কোবাল্টের একটা টুকরোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনোটা আবার অন্যদের পিঠের ওপর দিয়ে মাঝখানে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

'দেখ, ওদের যুদ্ধ দেখ!' কুকলিং আনন্দের সঙ্গে বলল। হাততালি দিচ্ছে সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কুকলিং যেখানে কোবাল্ট ফেলেছিল কুরুক্ষেত্রে পরিণত হল জায়গাটা। করুক্ষেত্রে আরো রোবট এসে যোগ দিতে লাগল।

কোবাল্টের ছিটেফোঁটার আস্বাদ পেয়েছে যেগুলো আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তারা। আগ্রাসী ভূমিকা নিল। সতীর্থদের আক্রমণ করল এবার।

যারা কোবাল্টের স্বাদ পেয়েছে তারাই লড়াই করছে। ধাতুর আশায় দ্বীপের বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসতে লাগল রোবটরা। যত বেশি কাঁকড়া কোবাল্টের ভাগ পেল, লড়াই তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। এ সময় যেগুলো জন্মাল যুদ্ধে যোগ দিল সেগুলোও।

রোবটদের নতুন প্রজাতি দেখা গেল— আকারে ছোট অথচ অসম্ভব গতিশীল। পিঠের বড় আয়না থেকে সৌরশক্তি সঞ্চয় করছে ওরা। অনেক বেশি আগ্রাসী। এক সঙ্গে অনেকগুলো কাঁকড়াকে আক্রমণ করছে এবং টুকরো করে ফেলছে।

পানিতে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে কুকলিং। মুখে আত্মতৃপ্তির ছাপ। হাত রগড়াতে রগড়াতে সে বলল, 'ভালো, দারুণ। এটাই আশা করেছিলাম।'

যুদ্ধ দেখতে দেখতে হতাশ আমি। ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। এই যুদ্ধের পরিণাম কী?

দিনের বেলা পেরুতে না পেরুতে আমাদের তাঁবুর চারপাশ যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ নিল। দ্বীপের নানা স্থান থেকে রোবট এসে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। তবে যুদ্ধ হচ্ছে নীরবে। চিৎকার, চেঁচামেচি, বন্ধুকের গুলির আওয়াজ কিছুই নেই। শুধু বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ এবং ধাতুর শরীরের সাথে ধাতুর শরীরের আঘাতের শব্দ শোনা যায়।

এই মাত্র জন্মাল নতুন ধরনের কাঁকড়াগুলো। হোঁতকা মতো। দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। এবার বিরাট আকারের কিছু কিছু কাঁকড়ারও জন্ম হল। ওদের চলাফেরা শ্লথ। তবে প্রচণ্ড শক্তিধর।

সূর্যাস্তের সময় ছোট কাঁকড়াগুলোর আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা দিল। পশ্চিম দিকে ভিড় জমাতে শুরু করল, ওরা তারপর ধীরগতিতে এগোতে শুরু করল।

'এই দলটা এবার ধ্বংস হবে!' কর্কশ গলায় কুকলিং বলল, 'ওদের অ্যাকুমুলেটর নেই। সূর্য ডোবামাত্র শেষ হয়ে যাবে।'

তাই হল। ঝোপঝাড়ের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে কাঁকড়া দলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, নিশ্চল হয়ে গেল ওরা। ওরা আর ভয়ঙ্কর যোদ্ধা রইল না। প্রাণহীন কিছু ধাতুর বাক্স ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রায় তিন চার ফুট উচ্চতার কাঁকড়াগুলো এগিয়ে গেল ওদের দিকে। একের পর এক ছোট কাঁকড়াগুলোকে খেতে শুরু করল। আরো বড় প্রজাতি দেখা যাবে হয়তো এরপর।

কুকলিং ভ্রূকুটি করল। এটা পরিষ্কার, এই ধরনের বিবর্তন চায় নি ও। ধীরগতির বড় আকৃতির কাঁকড়াগুলো শত্রুপক্ষের ধ্বংসসাধনে ততটা পারদর্শী হবে না।

বড় কাঁকড়াগুলো ছোট কাঁকড়াদের সাবাড় করার সময় সমুদ্র তীর শান্ত ছিল। আমি পানি থেকে তীরে উঠে এলাম। কুকলিং আমাকে অনুসরণ করল। বিশ্রামের আশায় দ্বীপের পূর্বদিকে রওনা দিলাম।

আমি এত ক্লান্ত ছিলাম যে তপ্ত বালুর ওপর শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে একটা ভয়ার্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। বালির চড়া, সমুদ্র, আকাশের তারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

অনুচ্চ চিৎকারটা বারবার কানে আসছিল। তারপরই খেয়াল হল কুকলিং আমার সাথে নেই। ওর চিৎকারের উৎস লক্ষ্য করে ছুটলাম আমি।

শান্ত সমুদ্র। মৃদু ঢেউ দোলা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের খাবারের টিনগুলো যেখানে রেখেছি সেখানকার পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন হচ্ছে। পানি ছিটাচ্ছে কিছু একটা। আমার মনে হল কুকলিং আছে ওখানে।

'তুমি এখানে কী করছ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। পানির তলার স্টোরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'আমি এখানে!' ডানদিক থেকে কুকলিং-এর গলার স্বর ভেসে এল।

'ঈশ্বরের দোহাই, কোথায়?'

'এইখানে', আবার ওর গলা শুনতে পেলাম। 'চিবুক পর্যন্ত পানিতে ডুবে আছি। এইদিকে এস।'

ওর দিকে পা বাড়াতেই পানির মধ্যে কঠিন কিছুর সাথে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। একটা বিরাট কাঁকড়া পানির নিচে লম্বা লম্বা দাঁড়ার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

'এত গভীর পানিতে নেমেছ কেন? ওখানে করছটা কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম কুকলিংকে।

'আমাকে তাড়া করে এখানে নিয়ে এসেছে ওরা!' কাতর স্বরে জবাব দিল কুকলিং।

'ওরা তোমাকে তাড়া করেছে? কারা?'

'কাঁকড়া!'

'অসম্ভব। কই আমাকে তো তাড়া করছে না!'

আবার পানিতে একটার সাথে ধাক্কা খেলাম। কিন্তু ওটাকে পাশ কাটিয়ে বৈজ্ঞানিকের কাছে পৌঁছলাম। চিবুক পর্যন্ত পানিতে ডুবে আছে।

'কী হয়েছিল বল?'

'নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না', ভীত কম্পিত গলায় বলল, 'ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ একটা কাঁকড়া আক্রমণ করল... আমি ভাবলাম ভুল করেছে বোধহয়। ভুল বুঝতে পারলেই সরে যাবে। কিন্তু আবার এগিয়ে এল ওটা আমার কাছে, দাঁড়া দিয়ে মুখ স্পর্শ করল...। তখন আমি উঠে সরে গেলাম একপাশে। ওটাও আমার পিছু পিছু এল। আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। কাঁকড়াও দৌড়াতে শুরু করল। আরেকটা কাঁকড়া যোগ দিল দৌড়ে। তারপর দলে ভারী হতে শুরু করল ওরা। আমাকে তাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছে...?'

'আশ্চর্য! এমন তো আগে ঘটে নি', আমি বললাম, 'বিবর্তনের ফলে ওদের মধ্যে মানুষকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি জেগে থাকলে আমাকেও তো রেহাই দিত না।'

'জানি না', কাঁপা গলায় বলল কুকলিং, 'কিন্তু ডাঙ্গায় উঠতে ভয় লাগছে আমার।'

'বাজে কথা বোলো না', ওর হাত ধরে আমি বললাম, 'পূর্ব তীরে ধরে এগিয়ে চল। আমি তোমাকে রক্ষা করব।'

'কীভাবে?'

'অচিরেই আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারের কাছাকাছি চলে আসব আমরা। সেখান থেকে ভারী একটা কিছু তুলে নেব আমি। এই ধর হাতুড়ি বা অন্যকিছু।'

'কোথাও কোনো ধাতু নেই,' আর্তনাদ করে বলল কুকলিং। 'তারচেয়ে পেটিগুলো থেকে একটা বোর্ড কিংবা কাঠের কিছু যোগাড় করো।'

তীর ঘেঁষে ধীরে ধীরে চললাম। খাদ্যভাণ্ডারের কাছে এসে কুকলিংকে একা রেখে এগিয়ে গেলাম আমি।

মেশিনের পরিচিত গুনগুন শব্দ কানে এল। কাঁকড়ারা টিন খুলতে শুরু করেছে। তার মনে টিনের খাবারে সন্ধান পেয়েছে ওরা।

'কুকলিং সর্বনাশ হয়ে গেছে!' চিৎকার করে বললাম আমি, 'আমাদের সব টিন খিয়ে ফেলছে ওরা।'

'তাই নাকি?' সে বলল বিলাপের সুরে, 'এখন আমরা কী করব?'

'ওটা তোমার ভাববার কথা। আমাদের এই দশার জন্য তুমিই দায়ী। এই ধরনের বিবর্তিত মেশিন তুমিই চাইছিলে। তুমি সব ভজগট করে ফেলেছ।'

কাঁকড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে তীরে উঠে এলাম। অন্ধকারে হামা দিয়ে কাঁকড়াদের মাঝ থেকে তুলে নিলাম মাংস, আনারস, আপেলসহ অন্যান্য খাবার। মালভূমির ওপর রেখে এলাম সব। আমরা গভীর ঘুমে অচেতন থাকা অবস্থায় কাজ শুরু করেছিল কাঁকড়ার দল। একটা টিনও আস্ত রাখে নি।

আমি যখন খাদ্যদ্রব্য কুড়োতে ব্যস্ত তখন কুকলিং বিশ হাত দূরে সমুদ্রের মাঝে চিবুক পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে। একসঙ্গে এত কিছু ঘটে যাওয়ায় আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম যে, কুকলিং-এর কথা মনেই ছিল না। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার সজাগ হয়ে উঠলাম।

'ঈশ্বরের দোহাই বাড, আমাকে বাঁচাও। ওরা তাড়া করছে আমায়।'

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাঁকড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কুকলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ওর পাঁচ হাত দূরে থাকতে আরেকটি কাঁকড়ার সাথে ধাক্কা লাগল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না সেটা।

'তোমাকে এত অপছন্দ করছে কেন ওরা? তুমি তো ওদের স্রষ্টা।' বললাম আমি।

'জানি না', গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে বিজ্ঞানীর, 'একটা কিছু করো বাড, সরাও ওটাকে। এর চেয়ে বড় কাঁকড়া জন্মালে দফারফা হয়ে যাবে আমার।'

'এ জন্য তুমিই দায়ী। আচ্ছা বল দেখি কাঁকড়ার কোন জায়গাটা নরম? কী করে ধ্বংস করা যাবে ওটাকে।'

'আগে হলে পিঠের আয়না ভেঙ্গে দেয়াই যথেষ্ট হত। অ্যাকুমুলেটার বের করে নিলেও অচল হয়ে পড়ত ওরা। কিন্তু এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে কিছুই বলতে পারছি না। এর জন্য আলাদা গবেষণার প্রয়োজন।'

'রাখ তোমার গবেষণা।' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বললাম আমি। বিজ্ঞানীর মুখের দিকে একটা কাঁকড়ার সামনের পা এগিয়ে যাচ্ছিল, সেটা চেপে ধরলাম তাড়াতাড়ি।

রোবট পিছু হটল। আমি দ্বিতীয় পাও খুঁজে পেলাম। তামার তারের মতো, সহজেই মুচড়ে ফেললাম ওগুলো।

ধাতু জীবের এই ব্যবহার পছন্দ হল না। পিছু হটে ধীরগতিতে তীরে উঠে গেল ওটা। কুকলিং আর আমি তীড়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে এলাম।

পূর্বে সূর্য ওঠামাত্র সবকটা রোবট পানি ছেড়ে তীরে উঠে পড়ল। রোদ পোহাতে লাগল তারা। পাথর মেরে আমি প্রায় পঞ্চাশটা কাঁকড়ার পিঠের আয়না ভেঙে দিলাম। অচল হয়ে পড়ে রইল সেগুলো।

এতে অবশ্য বিশেষ লাভ হল না। অচিরেই অন্য রোবটের খাদ্য পরিণত হল তারা এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততায় নতুন কাঁকড়ার জন্ম দিল। সব কাঁকড়ার সিলিকন ব্যাটারি ধ্বংস করার শক্তি আমার ছিল না। বেশ কয়েকবার রোবটের স্পর্শে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শক্তিই হারিয়ে ফেললাম প্রায়।

পুরো সময়টা সমুদ্রের পানিতে দাঁড়িয়ে রইল কুকলিং।

অচিরেই আবার কাঁকড়াদের গৃহযুদ্ধ শুরু হল। দেখে মনে হল কুকলিংকে ভুলে গেছে ওরা।

যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দ্বীপের অন্য অংশে চলে গেলাম আমার। ঘণ্টার পর ঘন্টা সমুদ্রের পানিতে থাকায় কুকলিং-এর শরীর অবশ হয়ে গেছে। হাত পা ছড়িয়ে বালির ওপর শুয়ে পড়ল সে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে তার। ওই অবস্থায় আমাকে সে বলল গরম বালি দিয়ে তাকে চাপা দেয়ার জন্য।

পোশাক আর খাবার নিতে তাঁবুতে ফিরে এলাম আমি। দেখতে হল তাঁবুর ধ্বংসাবশেষ। বালিতে পোঁতা লোহার খুঁটি অদৃশ্য হয়েছে। তাঁবু টানা দেয়ার ধাতুর রিংও অদৃশ্য।

তেরপলের নিচে আমাদের পোশাক খুঁজে পাওয়া গেল। এখানেও ধাতুর খোঁজ করেছে কাঁকড়া দল। ধাতুর হুক, বোতাম, বকেলস্ সবই উধাও। পোশাকের স্থানে স্থানে পোড়া দাগ চোখে পড়ল।

এদিকে বোবটদের যুদ্ধক্ষেত্র বদল হয়েছে। সমুদ্র তীর থেকে দ্বীপের অভ্যন্তরে সরে এসেছে ওরা। মালভূমি থেকে দেখতে পেলাম প্রায় মানুষের মতো লম্বা দৈত্যাকৃতি কাঁকড়ারা ঝোপঝাড়ের কাছে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে ওরা। তারপর দ্রুত পরস্পরকে আক্রমণ করছে। ধাতুর সাথে ধাতুর আঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম। ধীর গতির এই বিশাল কাঁকড়াগুলো যেমন ওজন, তেমন শক্তিও রয়েছে ওগুলোর।

চোখের সামনে অসংখ্য যন্ত্রদানব টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম আমি।

উন্মাদ যন্ত্রদানবদের যুদ্ধ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। তাই তাঁবুতে যা পেলাম তা নিয়েই কুকলিং যেখানে ঘুমাচ্ছে সেদিকে পা বাড়ালাম। সূর্যের তাপ অসহ্য ঠেকছিল। তাই কুকলিংকে যেখানে বালু চাপা দিয়ে এসেছি সেখানে যাবার আগে সমুদ্রের পানিতে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিলাম।

কুকলিং-এর কাছে যাবার পথে মালভূমির ঝোপের ভেতর থেকে বিশাল একটা কাঁকড়া বেরিয়ে এল। আমার চেয়েও লম্বা ওটা। লম্বা প্রকাণ্ড দাঁড়া। দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে চলছিল। সামনের শুঁড় অস্বাভাবিক লম্বা। চলার সময় বালিতে দাগ টেনে যাচ্ছিল।

'ইথিওসরাস' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা।হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছে সে। এদিক ওদিক সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। বেলাভূমির ওপর দিয়ে ধীরগতিতে চলছে সে। এঁকেবেঁকে কুকলিং শুয়ে আছে যে ঢিবির নিচে সেদিকে এগিয়ে চলল ওটা।

আমি ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতে পারতাম কুকলিং-এর দিকে যাচ্ছে ওটা তা হলে দৌড়ে যেতাম ওকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু মেশিনটার চলাফেরা এমন খাপছাড়া ছিল যে, মনে হল সমুদ্রের পানিতে নামবে বুঝি। সমুদ্রের পানি প্রথম ছোঁয়া পাওয়ামাত্র অকস্মাৎ ঘুরে গেল দানবটা। কুকলিং-এর দিকে এগিয়ে গেল তারপর। হাতের মালপত্র ফেলে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম আমি কুকলিং-এর দিকে।

'ইথিওসরাস' কুকলিং-এর পাশে গিয়ে থামল। নিচু হল একটু। আমি দেখতে পেলাম ওটার লম্বা শুঁড় বালির তলায় কুকলিং-এর মুখের পাশে কাজ শুরু করে দিয়েছে। তারপর আচমকা একটা বালির মেঘের সৃষ্টি হল যেন। এক ঝটকায় কুকলিং উঠে বসল। দানবের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

যন্ত্রদানব তার সরু শুঁড় দিয়ে কুকলিং-এর মাংসল ঘাড় জড়িয়ে ধরল। ওকে তুলে মুখের কাছে নিয়ে এল। শূন্যে অসহায়ভাবে দুলতে লাগল কুকলিং। হাত পা ছুড়ছে অবিরাম।

কুকলিংকে অন্তর থেকে ঘৃণা করলেও যন্ত্রদানবের হাতে তার অসহায় মৃত্যু মেনে নিতে পারলাম না। কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঁকড়ার একটা পা ধরে টান মারলাম। কিন্তু আমি যন্ত্রদানবের স্টিল পোস্টের মতো পা সরাতে পারলাম না। 'ইথিওসরাস' একচুল নড়ল না।

কাঁকড়ার পিঠে চেপে বসলাম আমি। কুকলিং-এর বিকৃত চেহারা আমার মুখের সামনে চলে এল। 'ওর দাঁত!' হঠাৎ বুঝতে পারলাম। কেন কুকলিং যন্ত্রদানবদের শিকারে পরিণত হয়েছে। ওর রয়েছে স্টেনলেস স্টিলের নকল দাঁত।

সূর্যের আলোয় দানবের পিঠের আয়না জ্বলজ্বল করছিল। ঘুষি পাকিয়ে ওটার ওপর আঘাত হানলাম আমি সজোরে।

কাঁকড়াটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। কুকলিং-এর ফ্যাকাসে চেহারা, বিস্ফারিত চোখ সরে এল দানবের মুখের সমরেখায়। তখনই ঘটল ঘটনা। কুকলিং-এর কপালে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ আঘাত হানল। কাঁকড়াটির শুঁড় ছুটে গেল এবং ধাতব প্লেগের স্রষ্টার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল বালিতে।

আমি যখন কুকলিং-এর লাশ কবর দিচ্ছি তখন আবার দ্বীপের বিভিন্ন অংশে বড় বড় কাঁকড়াদের যুদ্ধ বেধে গেল। আমার বা কুকলিং-এর লাশ নিয়ে তাদের আর মাথাব্যথা নেই কোনো।

তাঁবুর ক্যানভাস দিয়ে লাশটা জড়িয়ে দ্বীপের ঠিক মাঝখানে অগভীর বালির গর্তে কবর দিলাম। দুঃখ কিংবা অনুশোচনা কোনো অনুভূতি ছিল না তখন আমার। মুখের ভেতর বালুকণা ঢুকে পড়েছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এই ভয়ঙ্কর আবিষ্কারের জন্য মনে মনে অভিশাপ দিয়েছিলাম কুকলিংকে।

এরপর বেশ কদিন দ্বীপের ওপর শুয়ে থাকলাম আমি। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতাম 'ডোভ' জাহাজের আশায়। সময় যেন পেরুতে চায় না। সূর্যটা এখন আমার মাথার ওপর। মাঝে মাঝে সমুদ্রে নেমে পানিতে ডুব দিয়ে আসতাম।

ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে গেলাম আমি। অদ্ভুত অবাস্তব সব চিন্তা মাথায় এসে ভিড় জমাতে লাগল। একা একা ভাবতাম পৃথিবীতে কয়জন আছে যারা মানুষের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না? যেমন কুকলিং-এর এই আবিষ্কার। আমি নিশ্চিত ছিলাম ওর আবিষ্কার ভালো কোনো কাজে লাগান যেত—যেমন খনি থেকে ধাতু উত্তোলন। জীবের এ বিবর্তন সুষ্ঠুপথে চালিত হলে হয়তো আরো ভালো ফল পাওয়া যেত। শেষ পর্যন্ত আমি স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, এই মেশিন ক্রুটিহীন হলে কিছুতেই এমন কুৎসিত দানব তৈরি হত না।

একদিন আমার গায়ের ওপর একটা বিরাট গোলাকার ছায়া এসে পড়ল। অতিকষ্টে মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করলাম, সূর্য আর আমার মাঝখানে কার আর্বিভাব ঘটল। দেখলাম একটা বিশাল কাঁকড়ার শুঁড়ের মাঝখানে শুয়ে আছি। কাঁকড়াটি পানির কিনারায় এসে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে কারো আর্বিভাবের আশায়।

তারপর বারবার আমার দৃষ্টিবিভ্রম হতে লাগল। জ্বরের ঘোরে বিশাল কাঁকড়াগুলোকে পানির একেকটা চৌবাচ্চার মতো মনে হয়। এগুলো এত উঁচুতে যে, কোনোভাবেই নাগাল পাচ্ছিলাম না আমি।

নৌকার পাটাতনে শুয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন গ্যেল যখন জানতে চাইল বালির চড়ায় শুয়ে থাকা অদ্ভুত মেশিনগুলোও তুলে নেবে কি না আমি তখন জবাবে বললাম, 'তার কোনো দরকার নেই।'

অনুবাদ ঃ হাসান খুরশীদ রুমী

অ্যানিভারসারি ডেট

ভ্লাদিমি খ্লুমভ

জাঁকাল ডিনার খাবার পরে নরম আর্মচেয়ারে জাঁকিয়ে বসল ফিনে অলড্রিন। তারপর চিরাচরিত অভ্যেসমতো খবরের কাগজটা তুলে নিল। কাগজের প্রধান শিরোনামগুলো সবই টানটান রাজনৈতিক খবরে ঠাসা। ফিনে হাই তুলে অন্য পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল। অধিকাংশ স্বাভাবিক লোকজনের মতো সেও কাগজের শেষ পৃষ্ঠা থেকে পড়তে শুরু করল। খেলার খবর গুলোর মধ্যে একটা খবর তাকে আনন্দ দিল বিশেষভাবে। সেটা হলো প্রাদেশিক গ্লাইডার ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে তার পছন্দের দলের বিজয়। পাতা উল্টিয়ে অন্য বিভাগের শিরোনাম দেখল সে- 'একশো বছর আগে।' লেখাটিতে একশো বছর আগের মজাদার সব বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের। যেমন, ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি অতি ক্ষমতা সম্পন্ন রেলওয়ে ইঞ্জিন সাফল্যের সাথে প্যারিস এবং বোরডৌ-এ মধ্যে চলাচল করে—যাত্রীবাহী এই ট্রেন ঘন্টায় ২০০ মাইল বেগে পৌঁছে।

ফিনে হাসল এই ভেবে যে তার নিজের ব্যক্তিগত গ্লাইডার এরচেয়ে দ্বিগুণ দ্রুতগতিতে যেতে পারে। সে আর কিছু কৌতুহলউদ্দীপক খবর পড়ল, কিন্তু তার ডিনার পরবর্তী স্বাভাবিক ঘুমের কারণে খবরগুলো তার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে ব্যর্থ হল। ঘুমানর জন্য প্রস্তুত হল সে, কিন্তু ঠিক তখনি একটা ছোট্ট খবর তাকে হঠাৎ করে নাড়া দিল। বিস্ময় নিয়ে উঠে বসল ফিনে। লাইনগুলো আবার পড়ল সে, বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখদুটোকে! লেখা রয়েছে

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে অ্যাপোলো নামের একটি মহাকাশযান কিছু ক্রু নিয়ে কেপ কেনেডি থেকে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মহাকাশচারীরা চাঁদে অবতরণ করে এবং তারপর ফিরে আসে পৃথিবীতে। আরেকবার খবরটি পড়ল ফিনে, তারপর চিৎকার করে ডাকল, 'জো!'

একটা গৃহস্থলী রোবট চাকার উপর গড়িয়ে রুমে এসে ঢুকল।

'এই যে আমি, স্যার, আপনার সেবায়।'

'জো, এই লেখাটা পড়,' ফিনে বলল।

কয়েক মিনিট খবরের কাগজটার দিকে তাকাল রোবটটা, তারপর মাথাটা তুলে বলল, 'স্যার, আমাকে ডিশগুলো ধুতে হবে। সাপারে আপনি কী খেতে চান?'

'ভাজা মাইক্রোচিপ, নির্বোধ কোথাকার!' জ্বলে উঠল ফিনে। 'এখানে কী লেখা রয়েছে সে ব্যাপারে তোমার মতামত চেয়েছি, তা না করে আমাকে জিজ্ঞেস করছ সাপারে কী খাব। এ ব্যাপারে তোমার ভোঁতা মাথায় কী তথ্য রয়েছে?'

'স্যার, আমি ডিশগুলো ধুতে যাব। সাপারে আপনি কী খাবেন?'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রোবটটার কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। রাগে তার দিকে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে মারল ফিনে, যেন ওটা একটা ফ্রাইং প্যান। কিন্তু খবরের কাগজটা পত পত করে উড়তে লাগল, ওর পাতাগুলো মনে হচ্ছিল আহত পাখির ডানা। ওটা গিয়ে পড়ল রোবট এবং তার মাঝখানে।

'প্রিয় জো,' নিজেকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণে রেখে বলল ফিনে। 'আমাকে দয়া করে বল চাঁদে অভিযানের বিষয়ে তোমার মাথায় কী তথ্য রাখা আছে?'

রোবটটা "চাঁদ" এবং "অভিযান" শব্দ দুটো কয়েকবার উচ্চারণ করল, তারপর এক হাত তুলল যেন কিছু একটা মনে করছে এমন ভাব করল। এরপর বলল, 'জুল ভের্ন–ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন, হার্বার্ট ওয়েলস–দি ফার্স্ট মেন অন দ্য মুন।' রোবটটা আরো কিছু নাম বলতে লাগল, কিন্তু ফিনে থামাল ওকে।

'যথেষ্ট হয়েছে! সায়েন্স ফিকশান ছাড়া কি আর কিছুই তুমি জান না?'

'স্যার, আমাকে যেতে দিন। ডিশগুলো ধোবো। সাপারে আপনি কী খেতে চান?'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়াল ফিনে, তারপর পুরান বন্ধু জেরি সিলবার্গের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ভিডিও ফোন নাম্বারে ডায়াল করল। একটা ক্লান্ত মুখ ফুটে উঠল স্ক্রিনে।

'হ্যালো, ফিনে!'

'হ্যালো, জেরি। আজকের 'দি টাইমস' পত্রিকাটি পড়েছ?'

'না। সবতো একই খবর। আমার গলা পর্যন্ত কাজ। খবরের কাগজ পড়ার সময় নেই।'

'দেখ! কী বাজে কথা লিখেছে এখানে। একশো বছর আগে শিরোনামের নিচে ওরা লিখেছে, আমেরিকান মহাকাশচারীরা চাঁদে অবতরণ করে। নিজের চোখে দেখ।' কাগজটা তুলে ধরল ফিনে, ভিডিও ফোনের সামনে নিয়ে এল।

স্ক্রিনে ভেসে থাকা মুখটা হতভম্ব দেখাল।

'এটা নিছক কৌতুক,' জেরি বলল।

'একটা ফালতু কৌতুক। আর আজকে পহেলা এপ্রিল নয়।'

'না, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। এটা একশো বছর আগের কৌতুক।'

'তারপরও সেদিনটা পহেলা এপ্রিল ছিল না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল জেরি। 'তুমি ঠিকই বলেছ। এরমধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে। তোমার বাসার লোকজন কী বলে?'

'রবার্ট স্কুলে। স্যু এখন ফ্যাশন হাউজে, আর জো খবরটা পড়ার সময় চোখ পিটপিট করছিল। আমি কি সম্পাদকদের ফোন করব?'

'তুমি কি ওদের হাসাতে চাও? ওরা বলবে, একটা নির্বোধ এই জিনিসটা নিয়ে পড়ে আছে।'

এক গাদা কাগজ হাতে এক লোককে স্ক্রিনে দেখা গেল। কাগজগুলো দিকে তাকাল জেরি, তারপর ভিডিও ফোনে বলল, 'দেখ ফিনে, আমার হাতে কিছু কাজ চলে এসেছে। সন্ধ্যায় কথা হবে।'

'ঠিক আছে,' সায় দিয়ে ভিডিও ফোনের সুইচ বন্ধ করে দিল ফিনে।

রান্নাঘর থেকে ডিশের ঠনঠন শব্দ আসছে। ফিনে এদিক ওদিক তাকাল কিছু রেফারেন্স বইয়ের খোঁজে। কিন্তু তার চারপাশে খবরের কাগজ, জার্নাল আর ছোট ছোট পুস্তিকার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ অবস্থায় কী করার আছে। জো ছিল, দি ইউনিভার্সাল রোবট কোম্পানির মতে, 'সবজান্তা'।

ভিডিও ফোনের কাছে ফিরে গেল ফিনে। যোগাযোগ করল ফ্যাশন হাউজের সাথে।তার স্ত্রী তখন মুখভর্তি পিন নিয়ে ডামিতে কিছু একটা করছিল। স্ত্রী মাথা নেড়ে তাকে জানাল যে বেলের শব্দ সে শুনেছে। অবশেষে ডামি ছেড়ে এসে ফিনের দিকে ঘুরল সে।

'কী ব্যাপার? তুমি জোকে অকেজো করে দিয়েছ। বেচারা রোবট! তাই না?' ফিনে একটা কথাও বলার সুযোগ পেল না। 'রবার্ট? না! ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। তুমি আমাকে শুধু এই বলতে ফোন করেছে যে কয়েক যুগ তুমি আমাকে দেখনি, আর তাই আমাকে ভয়ানকভাবে মিস করছ। কথার মধ্যে বাধা দিওনা। তুমি আমাকে একটা কথাও বলতে দাও না। শোনো, রেগে যেওনা। এই স্টাইলটা দেখ, খুব সুন্দর, তাই না?'

'স্যু!' চিৎকার করে উঠল ফিনে। তারফলও পাওয়া গেল। তার স্ত্রী পুরোপুরি চুপ হয়ে গেল।

'স্যু, তোমার কি মনে হয়, মানুষ চাঁদে গেছে নাকি যায়নি?'

'চাঁদে?'

'হ্যাঁ, চাঁদে!' ফিনে আবার বলল।

'কী হয়েছে, ফিনে? তাড়াতাড়ি বল?'

'থাম, স্যু। কিছুই হয়নি। আমাকে শুধু বল, তুমি দেখলে লোকজন চাঁদে গেছে তাহলে কী বলবে?'

'আমি বলব, বোকার মতো কথা বল না। এ ধরনের অর্থহীন অভিযানের চিন্তা কে করে?'

'অর্থহীন কথাটা ঠিকই বলেছ।' ফিনে বলল, তারপর ভাবতে লাগল সে। 'কিন্তু আজকের দি টাইমস পত্রিকায় এটা লেখা হয়েছে যে একশো বছর আগে মানুষ চাঁদে গিয়েছিল।'

'এ ব্যাপারে জেরি কী বলে?' জিজ্ঞেস করল স্যু। 'তুমি তার সাথে কথা বলেছ, বলোনি?'

'জেরি বলেছে যে এটা একটা কৌতুক। আমি জো-এর কাছ থেকেও কিছু বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে বারবার শুধু একই জিনিস, তার ডিশ ধোয়ার কথাই বলতে লাগল। সে আসলেই জানে এরকম কিছুই ঘটেনি।'

'একমিনিট দাঁড়াও, কেন তুমি বললে সে বারবার শুধু একই জিনিস বলতে লাগল? আর তাই তুমি তার ফিউজে আঘাত করেছ?'

'আমি করিনি। সে রান্নাঘরে, ডিশ ধোয়ামোছা করছে।' ফিনে ঘুরল। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল জো। স্পষ্টত শুনছিল স্যু-এর সাথে ফিনের কথোপকথন।

'কিছু মনে করো না, স্যু। তুমি ব্যস্ত আছ। মহাব্যস্ত।'

তারা সুইচ বন্ধ করে দিল।

ভিডিও ফোনের কালো স্ক্রিনে ফিনের ভয়ার্তমুখ প্রতিফলিত হল। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বসে রইল ফিনে, তারপর ভিডিও ফোনটা আবার চালু করল। স্ক্রিনে আবার ভেসে উঠল ফ্যাশন হাউজটা।

'স্যু, ওরা কি এটা নিছক মজা করার জন্য করেছে?'

ডামির পেছনে ছিল স্যু।

'কাদের কথা বলছ? ওরা কী করেছে!' নির্ভেজাল হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করল স্যু।

'যে মানুষগুলো চাঁদে গিয়েছিল।'

'অ্যা- অ্যা। সম্ভবত। আমি এসব নিয়ে চিন্তাই করিনা। কী নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম? তুমি সিস্টেম ভুলেই গেছ।'

'তুমি মনে করো যে সিস্টেমের সবসময় অস্তির থাকে?'

'ওহ্। তুমি খুব বিরক্ত করো। আমাকে শান্তিমতো কাজ করতে দাও।' স্ক্রিনটা কালো হয়ে গেল। ফিনে তাকাল রোবটটার দিকে। রোবটটা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়।

'জো, তোমার ডিশ ধোয়া শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কখন, কারা সিস্টেম চালু করেছিল?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল ফিনে।

'সিস্টেম সব সময় অস্তিত্বের মধ্যে মিশে থাকে,' জো উত্তর দিল।

ভেতরে ঢোকার দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল। নিশ্চয় রবার্ট ফিরে এসেছে, ভাবল ফিনে।

'হ্যালো, বাবা', রুমে ঢুকে বলল রবার্ট। 'তোমার দলের জন্য বিশাল বিজয়! পত্রিকার টেবিলে বসে তুমি আমার দিকে এভাবে পুলিশের মতো তাকিয়ে আছ কেন? তুমি কি ভুলে গেছে? তুমি জান শিকাগো ব্ল্যাক হল... তুমি খবরটা দেখনি? এই যে দি টামইস। আমি সকালে পত্রিকাটা কিনেছি।' রবার্ট তার বাবার হাতে পত্রিকাটা ধরিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ,' অবশেষে ফিনে বলল। তারপর, কিছু একটা মনে পড়েছে এমন ভাবে দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল রুম থেকে। কিছু সময় তার পড়ার ঘরে তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজল। তারপর ফিরে এল রুমে। বলল, 'রবার্ট, তুমি কি জান পুরান চুরুটের বাক্সটা কোথায়?'

'দাদারটা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সাথে এস,' বলল রবার্ট, তারপর তার বাবাকে টেনে নিয়ে গেল পড়ার ঘরে। 'এই আর্ম চেয়ারটা সরাতে সাহায্য করো আমাকে।' তারা বইয়ের আলমারির কাছে আর্ম চেয়ারটা সরিয়ে আনল। স্টক এক্সচেঞ্জ বুলিটিনগুলো দিয়ে উঁচু করল ওটাকে। আর্ম চেয়ারের উপর উঠল রবার্ট। উপরের তাক থেকে ধুলোয় আচ্ছাদিত একটা বাক্স বের করে আনল। টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়ল ফিনে, তারপর বাক্সটা খুলল। ভেতরটাতে কিছু একটা খুঁজল সে, তারপর জানালার কাছে গেল।

'এই যে!' বলল সে, বাক্সটার ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে আনল। সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে তার পেছনে এসে দাঁড়াল রবার্ট। কিন্তু সামনে কিছুই দেখতে পেলনা, তার বাবা হাতের মুঠোর মধ্যে জিনিসটাকে লুকিয়ে ফেলেছে।

'অবাক হয়োনা, রবার্ট। আমি আগে কখনো তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি– তুমি কি ফ্যান্টাসি পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' নিজেকে শান্ত রেখে বলল রবার্ট।

'চাঁদে, ভিনগ্রহে, নক্ষত্রে ভ্রমন সম্পর্কে?' বলে গেল ফিনে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশেষ করে নক্ষত্রে ভ্রমণ সম্পর্কে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় জো এ সম্পর্কে আমাকে পড়ে শোনায়।'

'কখনো চিন্তা করেছ, মানুষ কবে চাঁদে যাবে?'

'কুড়ি বছরে কিংবা তার কাছাকাছি,' অনিশ্চিত ভাবে উত্তর দিল রবার্ট।

'মহাকাশে ভ্রমণ বাজে কথা,' অপ্রত্যাশিতভাবে কথার মাঝে ঢুকে পড়ল জো। 'ওটা ফ্যান্টাসির জগত। বাস্তবে সিস্টেম রয়েছে। তুমি কখনো তা পড়োনি, রবার্ট।'

'হা, হা...' দুর্বলভাবে হেসে উঠল ফিনে– 'সিস্টেম! মানুষেরা চাঁদে গেছে! সেখানে একটা উদ্দেশ ছিল...'

'স্যার, আপনি কি খররের কাগজের কথাটা বলছেন? ওটা একটা কৌতুক। আমি সম্পাদকদের সাথে যোগাযোগ করেছি। একটা বাজে কৌতুক। ওটার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের নিন্দা করা হয়েছে,' রোবট জানাল।

'বাবা, তুমিও কি চাঁদে ভ্রমণ সম্পর্কে কৌতুক করছ?'

'কে কৌতুক করছে? একশো বছর আগে মহাকাশচারীরা চাঁদে ভ্রমণ করেছিল।'

'মাফ করো, বাবা। জোয়ের কথাই ঠিক। তুমি গায়ের জোরে বলছ। যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তাহলে এখন কেউ চাঁদে যায় না কেন?'

'দেখ রবার্ট, মহাকাশে স্বাধীন সিস্টেমের অস্তিত্ব রয়েছে, কেউ একজন এটাকে সক্রিয় করে তুলেছে।'

'স্যার, সিস্টেম সব সময় সেখানে রয়েছে। এটা শান্তির অভিভাবক, রবার্ট। কোনো রকেট পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করলে সিস্টেম আপনা আপনি তাকে ভুপাতিত করবে। এটা নয় যে কেউ লম্বা রকেট তৈরি করে। ওগুলোর ব্যবহার নেই।'

'চুপ করো, ভোমবোল কোথাকার। আমার কথার মধ্যে কথা বলার সাহস কোথায় পেয়েছ?' রেগে উঠল ফিনে। 'ডিশগুলো ধুতে যাও কিংবা সাপারে কী দেবে সেটা নিয়ে চিন্তা করো।'

এরপর সে ফিরল তার ছেলের দিকে।

'রবার্ট, এক সময় একক কার্ডের বদলে কাগজের টাকা ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা কোনো উপলক্ষ্যে বিশেষ ধাতব মুদ্রা বের করত। দাদা ঐসব মুদ্রার একটি উদ্ধার করেছিলেন। আমিও সেটাকে রেখে দিয়েছি, যদিও আমার ধারনা নেই তা দিয়ে কী করব। এখন আমি জানি, চাঁদের বুকে ঈগলটির বসে থাকার অর্থ। বছর চলে যায়। মানুষ চাঁদে গেছে। তুমি কি সেটা বোঝো? তারা সেখানে হেঁটেছিল। এটা ছিল চাঁদে একটি সাফল্যজনক অভিযান। না, এটা কেবল চাঁদে না, এটা ছিল ভবিষ্যতে ভ্রমণ। অন্ততপক্ষে সেটা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি...'

ফিনে তার হাতের মুঠো খুলল। তার হাতের তালুতে একটা ভেজা রুপালি মুদ্রা। ওটার অমসৃণ পিঠে আঁকা রয়েছে উপত্যকা যা আকাশের পানে উঁচু হয়ে আছে, ঝুলিয়ে রেখেছে পৃথিবীকে...

অনুবাদ ঃ মিজানুর রহমান কল্লোল

রোবী

ইলিয়া ভারসাভস্কি

বেশ কয়েক মাস আগে আমি আমার পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী পালন করেছি।

আমার প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তার প্রশংসার পাশাপাশি সহজাত কিছু ভুলের কথা তুলে ধরে, প্রচুর হাততালি-টালির পরে রেডিওনিক্স ল্যাবরেটরি চিফ স্ত্রেকোজভ হাতের পানীয় গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'এখন আমাদের গবেষনাগারের সবচে' তরুণ রিপ্রেজেন্টেটিভ এই অনুষ্ঠানের নায়কটিকে সম্বর্ধিত করব।'

কথাটা শোনার পরে কেন জানি সবার নজর চলে গেল দরজার দিকে। নিরব হয়ে গেল প্রত্যেকে। এতই নিশব্দ চারদিক যে দরজায় আঁচড় কাটলেও শোনা যাবে।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল একটি রোবট। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

'এই রোবট', বলতে শুরু করলেন স্ত্রেকোজভ, 'একটি সেলফ-টিচিং অটোমেটিক মেসিন। এর ভেতরে পূর্ব নির্ধারিত কোনো প্রোগ্রাম পুরে দেয়া হয়নি, এ নিজেই পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিজের প্রোগ্রাম তৈরিতে সক্ষম। রোবটটির স্মৃতিতে সহস্রাধিক শব্দের ভাণ্ডার রয়েছে। আর এর ভোকাবুলারি বা কথা বলার ক্ষমতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি ছাপা অক্ষর পড়তে পারে সহজেই, বাক্য গঠন করতে পারে এবং বুঝতে পারে মানুষের কথা। রোবটটির ভেতরে রি-চার্জেব্‌ল্ ব্যাটারি রয়েছে, প্রয়োজনের সময় নিজে থেকেই চার্জ হতে থাকে। রোবটটি তৈরি করার পেছনে টানা

একটা বছর সময় দিয়েছি আমরা শুধু আজকের এই সন্ধ্যাটির জন্যে। এই রোবটকে আপনি ইচ্ছেমতো যা খুশি শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারবেন।'

'তো রোবি,' চিফ রোবটকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার নতুন মনিবকে "হ্যালো" বল।'

রোবি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, একটু বিরতি দিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'আমি সত্যি খুই আনন্দিত হব যদি আপনি আপনার পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমাকে মেনে নেন।'

রোবির শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে চমৎকৃত হলাম আমি। সবাই রোবিকে ঘিরে দাঁড়াল, আরেকটু ভালোভাবে দেখতে চায়।

রোবিকে বাড়িতে নিয়ে আসার পরে আমার শাশুড়ি বললেন, 'রোবি ন্যাংটো হয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ দৃশ্য আমার সহ্য হবে না। আমি ওর জন্য জামা বানিয়ে দেব।'

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি রোবি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নির্দেশের অপেক্ষায়। ব্যাপারটা বেশ মজা লাগল আমার।

'একটু কষ্ট করে আমার জুতোটা ঝকঝকে করে দাও, রোবি,' বললাম আমি। 'হলওয়ের দরজার কাছে ও জোড়া পাবে।'

'কিভাবে জুতো ঝকঝকে করে?' জানতে চাইল সে।

'খুব সহজ কাজ। লকারে তুমি কিছু ব্রাউন শু পলিশ পাবে ব্রাশসহ। পলিশটা জুতোয় মাখিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষতে থাক যতক্ষণ না ওটা ঝকঝকে হয়।'

রোবি বিনয়ী ভৃত্যের মতো হলওয়ের দিকে চলে গেল। ও কাজটা কিভাবে করে জানার খুব কৌতূহল হল আমার। গিয়ে যা দেখলাম রীতিমত ভিমড়ি খেলাম। রোবি, আমার স্ত্রীর নিজের হাতে বানান খুবানির আচার, যেটা বিশেষ অনুষ্ঠানে সে অতিথিদেরকে খেতে দেয়, সেটা পুরোটাই ঢেলে দিয়েছে আমার জুতোর ওপর।

'হায়, হায়, রোবি!' বললাম আমি। 'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি শু পলিশটা নিচের শেলফে আছে। তুমি ভুল বোতল এনেছ।'

'কোন বস্তুর স্থান সংক্রান্ত অবস্থান, জুতোর না থেকে আবর্জনা পরিস্কার করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত সুরে বলল রোবি, 'কো-অর্ডিনেটর ডেসকাটেস সিস্টেমের তিনটি কো-অর্ডিনেট দিয়ে নিরূপণ করা যেতে পারে। অনুমোদনের ব্যাপারটি এখানে বস্তুর, ডাইমেনশনকে অতিক্রম না-ও করতে পারে।'

'ঠিক, রোবি,' বললাম আমি। 'আমারই ভুল হয়েছে।'

'জায়গা বা স্থানের যে কোনো পয়েন্ট, বিশেষ করে এই ঘরে নির্দিষ্ট কোনো কোণকে সমন্বয়ের প্রয়োজনে স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে ধরা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তোমার কথা সব বুঝতে পেরেছি। ভবিষ্যতের জন্য এসব পরামর্শ বিবেচনাধীন রইল।'

'একটি বস্তুর সমন্বয় দিগবলয় এবং অক্ষাংশ থেকে কৌণিক ডাইমেনশনে বিচার করাও সম্ভব,' খরখরে গলায় বলেই চলল সে।

বললাম, 'তো ঠিক আছে। ভুলে যাও ব্যাপারটা।'

'এই ঘটনায় সহ্যশক্তির ব্যাপারটিও প্রশ্নের উদ্রেক করেছে, বস্তুর ডাইমেনসন এবং রেডিয়াস ভেক্টরের দৈর্ঘ্যের বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এক্ষেত্রে দিগবলয়ের দু'হাজার রেডিয়ান এবং অক্ষাংশের এক হাজার ভাগ রেডিয়ান অতিক্রম করা উচিত হবে না।'

'অনেক হয়েছে।' রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম এবার। 'এসব ফালতু বকোয়াস বন্ধ করো।'

ধমক খেয়ে মুখ বন্ধ করল বটে রোবি, কিন্তু সারাটা দিন আমাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে গেল সে এবং সুযোগ পেলেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইল আমি যে হাঁটাহাঁটি করছি তাতে ডান দিক হেলে হাঁটলে কতটা লাভ আর বাম দিকে হেলে হাঁটলেই বা কতটা লাভ।

সত্যি বলতে কি ওর অর্থহীন বকবকানির চোটে আমার মাথা ধরে গেল। দিনের শেষে মনে হলো আমার সমস্ত শক্তি যেন কেউ চুষে-ছিবড়ে নিংড়ে নিয়েছে।

অবশ্য ক'দিন যেতেই বুঝতে পারলাম রোবি হলো আঁতেল রোবট, কায়িক পরিশ্রম ওকে দিয়ে হবে না। শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ দিলেই সে বেজার হয়ে পড়ে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে অংকে ওর মাথা সাংঘাতিক সাফ।

আমার স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ি রোবিকে দুর্দান্ত অংকশাস্ত্রবিদ ঠাউরে বসেছে। যদিও আমার ধারণা ওর জ্ঞান-বুদ্ধি বেশিরভাগই ভাসা ভাসা।

একদিন চা খেতে বসে আমার স্ত্রী বলল, 'রোবি, রান্নাঘরে যাও। কিচেন থেকে কেকটা নিয়ে তিন ভাগ করে আমাদেরকে দাও।'

'ওটা সম্ভব হবে না,' কি ভেবে জবাব দিল রোবট।

'সম্ভব হবে না মানে?'

'কারণ একটা ইউনিটকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় না। এ ধরনের ভাগাভাগির ফলাফল হল বস্তুটি দশমিক ভগ্নাঙ্কে ছড়িয়ে পড়া যা দিয়ে অভ্রান্ত যথাযথতা পাওয়া সম্ভব নয়।'

আমার স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকল।

'আমার ধারণা রোবি ঠিক কথাই বলেছে,' বললেন আমার শ্বাশুড়ি। 'এরকম কথা আমি আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে।'

'রোবি,' বললাম আমি, 'এটা গাণিতিক বিজ্ঞানের কোনো সমস্যা নয়। এটা হল জ্যামিতিক ফিগারকে সমান তিনভাগে ভাগ করার একটি বিষয়। কেক জিনিসটা গোলাকার, কাজেই তুমি যদি পরিধীকে তিনভাগে ভাগ করো এবং বিভাজনের রেখাস্থলে ব্যাসার্ধকে ভাগ করো, তাহলে কেকটিকে তিনটে সমান ভাগে ভাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে।'

'যত্তসব বোকার মতো কথা!' বিরক্তি প্রকাশ পেল রোবির কণ্ঠে। 'একটি পরিধিকে তিনভাগে ভাগ করার আগে প্রথমে আমাকে ওটার দৈর্ঘ্য জানতে হবে। এই সমস্যার সমাধান করা এক কথায় অসম্ভব, কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণের সময় বৃত্তের সমকোণকে ঘিরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

'ও ঠিকই বলেছে,' সায় দিলেন শ্বাশুড়ি। 'স্কুলে এ বিষয়ে আমাদের পড়ান হয়েছে। একদিন আমাদের অঙ্কের শিক্ষক, যাঁর প্রশংসায় আমরা সবাই পঞ্চমুখ ছিলাম, ক্লাসরুমে ঢুকলেন...'

'এক মিনিট,' বাধা দিলাম আমি ভদ্রমহিলাকে, 'তবে একটা পরিধিকে তিনখণ্ডে বিভক্ত করার নানা উপায় রয়েছে। রোবি, আমার সাথে কিচেনে চল। কাজটা কিভাবে করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'যে লোকের চিন্তা-চেতনায় জড়তা আছে আমি তার কাছ থেকে কিছু শিখতে চাই না,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল রোবট।

রোবির এ কথাটা সহ্য হল না আমার স্ত্রীর। আমার সম্পর্কে কেউ বাজে মন্তব্য করলে সে বিষম রেগে ওঠে।

'চুপ করো, রোবি!' ধমকে উঠল সে। 'বেশি বাড় বেড়েছ তুমি।'

'আমি আপনার কথা শুনব না। আপনার কথা শুনব না,' বিড় বিড় করে বলতে বলতে রোবি সাউণ্ড রিসেপটরের টাম্বলারের সুইচ অফ করে দিল।

রোবির সাথে আমাদের প্রথম ঝগড়াটা বাঁধল সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে। একদিন ডিনারের সময় আমার পরিবারকে একটা কৌতুক শোনাচ্ছিলাম। জোকটা ছিল এরকম:

একবার এক সেলসম্যান স্টিমারে ভ্রমণে বেরিয়ে আরেক সেলসম্যানের সাথে দেখা হয়ে গেল।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল প্রথমজন।

'ওডেসায়,' জবাব দিল দ্বিতীয় সেলসম্যান।

'বললেন ওডেসায় যাচ্ছেন, তাই আমার ধারণা আপনি আসলে ওখানে যাচ্ছেন না। আর সত্যি যদি ওখানে যাত্রা করে থাকেন তাহলে মিছে কথা বলছেন কেন?'

আমার কৌতুকটা শুনে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

'দয়া করে শুরুর দিকে ডাটাগুলো আবার বলুন,' রোবি বলল।

কিন্তু একই গল্প বারবার বলতে কাহাতক ভালো লাগে, বিশেষ করে একই শ্রোতার কাছে। বিরক্তি চেপে গল্পটা আবার শোনালাম ওকে। গল্প শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল রোবি। শেষে বলল, 'এ অদ্ভুত ব্যাপার। সে যদি সত্যি ওডেসা যেতে থাকে এবং বলেও ওখানে যাচ্ছে, তাহলে তো আর সে মিথ্যা কথা বলছে না।'

'ঠিক, রোবি, কিন্তু জোকস-এর মধ্যে অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার থাকে বলেই ওগুলোর নাম কৌতুকী।'

'এটার মধ্যে সবকিছুই কি অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য?'

'না, সবকিছু নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন একটা পরিবেশ ছিল যা অবান্তর বা অদ্ভুত ব্যাপারকেও চটুল করে তুলেছে।'

'এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টিতে আলগোরিথমের ভূমিকা ছিল কি?'

'আমার ঠিক জানা নেই, রোবি। প্রচুর জোকস আছে পৃথিবীতে এবং কেউ অমন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটিকে বিচার করে না।'

'তাই বুঝি?'

সে রাতে একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে গেলাম আমি, কে যেন আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে, আমাকে উঠে বসতে বাধ্য করছে। চোখ মেলে দেখি রোবি।

'কি ব্যাপার? হয়েছেটা কি?' চোখ মুছতে মুছতে বললাম আমি।

'এ বলে এক্স সমান সমান ওয়াই, ওদিকে বি দাবি করছে এক্স ওয়াইয়ের সমান নয়, যেভাবে ওয়াই সমান এক্স, আপনার কৌতূকীর এটাই তো মূল ভাবার্থ?'

'জানি না, রোবি। ঈশ্বরের দোহাই লাগে তোমার অ্যালগোরিদম নিয়ে আমাকে এ রাতে জ্বালাতন করো না। একটু ঘুমোতে দাও।'

'ঈশ্বর বলে কেউ নেই,' বলে চলে গেল রোবি।

পরদিন আমরা টেবিলে বসেছি, রোবি ঘোষণার সুরে বলল, 'আমি একটা জোক বানিয়েছি আপনাদের শোনাব বলে।'

'বেশ বেশ। বলে ফেল,' উৎসাহ দিলাম ওকে।

'এক খদ্দের এক বিক্রেতার কাছে জানতে চাইল যে পণ্য সে বিক্রি করছে তার এক ইউনিটের দাম কত। বিক্রেতা বলল, পণ্যের এক ইউনিটের দাম এক রুবল। শুনে খদ্দের বলল, তুমি বলেছ দাম এক রুবল, কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি দামটা এক রুবলের সমান নয়। যদিও দামটা প্রকৃত অর্থেই এক রুবলের সমান। তুমি মিথ্যে বলছ কেন?'

'বাহ্, দারুন জোক তো!' আমার শ্বাশুড়ি উচ্ছসিত হয়ে বললেন। 'মনে রাখার মতো কৌতুকী।'

'আপনি হাসছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল রোবি।

'দেখ, রোবি,' বললাম আমি। 'তোমার কৌতুকীটা আমার কাছে খুব একটা হাসির মনে হয়নি।'

'না, এটা একটা হাসির জোক,' গো ধরে রইল রোবি। 'আপনাকে হাসতেই হবে।'

'আশ্চর্য তো! হাসির না হলে হাসব কি করে?'

'কিন্তু এটা অবশ্যই হাসির জোক। আপনাকে হাসতে হবে। আমি বলছি আপনাকে হাসতেই হবে। দেরি না করে হাসুন বলছি। এক্ষুণি! হা! হা! হা!' বলতে বলতে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠল রোবি।

আমার স্ত্রী টেবিলে চামচ রেখে আমার দিকে ঘুরে তাকাল।

'তোমরা দেখছি কোনোদিনই শান্তিতে খেতে দেবে না। তুমি কাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছ? বেচারী রোবিকে নির্বোধের মতো জোক শুনিয়ে মৃগী রোগী বানিয়ে ফেলেছ দেখছি।'

চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল সে, সেই সাথে আমার শ্বাশুড়িও। আকাশের দিকে নাক উঁচু করে রেখে এবং একটিও কথা না বলে, ঘরে রইলাম শুধু আমি আর রোবি। হঠাৎ রোবি উন্মাদের মতো আচারণ শুরু করল। নির্বোধ শব্দটি বোধহয় তাকে খুব প্রভাবিত করেছে। এটির যত সমার্থক শব্দ আছে তার ভাণ্ডারে, এবারে তাই ঢেলে দিতে শুরু করল সে।

'মূর্খ!' গলা চড়াল সে যত জোরে পারে, 'জড়বুদ্ধি সম্পন্ন! গর্দভ! পাগল! অপরিণত! স্নায়ুবিক পীড়াগ্রস্ত! হাসো, হাসো হে মহামূর্খ, কারণ এটা খুব মজার জোক। এক্স ওয়াইয়ের সমান নয়, কারণ ওয়াই এক্সের সমান। হা! হা! হা!'

রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। কিন্তু নিস্ফল আক্রোশে আমি শুধু মুঠো শক্ত করেই রাখতে পারলাম। ওকে কিছু বলার সাহস হল না। কারণ আমার ধারণা ওটার আচরণ এখন পাগলামির পর্যায়ে চলে গেছে। ওকে এখন না খেপানই ভালো। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে খিল খিল করে হাসতে হল। কিন্তু রোবট আমাকে আরো জোরে হাসতে বাধ্য করল।

পরদিন ডাক্তার এলেন আমাকে দেখতে। বললেন, আমার ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে সাংঘাতিক। বেডরেস্ট নিতে হবে।

সেই গ্রীষ্মে আমার স্ত্রী ছুটি কাটাতে গেল তার মা'র বাড়িতে। ঘরে রইলাম শুধু আমি আর রোবি।

'তোমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না আমার,' যাবার সময় বলে গেল স্ত্রী। 'রোবি তোমার দেখভাল করতে পারবে চমৎকারভাবে। তবে ওর সাথে কখনো লাগতে যেয়ো না।'

সেদিন সন্ধ্যার ঘটনা। খুব গরম লাগছিল বলে নাপিতের দোকান থেকে মাথা কামিয়ে এলাম। ডাকলাম রোবিকে। সাথে সাথে দোরগোড়ায় হাজির হয়ে গেল সে।

'রোবি, খানা লাগাও টেবিলে,' বললাম আমি।

'এই ফ্লাটে যত খাবার আছে সব এ বাড়ির মালিকের সম্পত্তি। আমি আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারব না, তাহলে অন্যের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

'আরে! আমিই তো এ বাড়ির মালিক।'

রোবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করল।

'আমার ইমেজে যে মানুষটির ছবি আছে তার সাথে আপনার চেহারা মিলছে না।'

'বোকা! আমি চুল ফেলে এসেছি তাই এরকম লাগছে। আমার কণ্ঠ শুনেও কি আমাকে চিনতে পারছ না?'

'মানুষের কণ্ঠ সহজেই নকল করা যায়,' শুকনো গলায় বলল রোবি।

'কিন্তু ১০১টা উপায় আছে প্রমাণ করার যে আমিই এ ফ্লাটের মালিক।'

'না। আমি বিশ্বাস করি না,' অবিচলিত কণ্ঠে বলল রোবি। 'আপনি এখান থেকে চলে যান। সহজে নিস্ক্রান্ত না হলে আমি বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হব।'

রোবির শক্তিশালী ধাতব হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। মুষকো ওই হাতের একখানা রদ্দা খেলেই হয়েছে। আমাকে আর খুঁজে পেতে হবে না। আর ও যে মিথ্যা হুমকি দিচ্ছেনা তা বোঝাতেই যেন মারমুখী ভাব নিয়ে সামনে পা বাড়াল রোবি। আমি এক লাফে অ্যাবাউট টার্ন করলাম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দে ছুট।

মাসখানেক আমার বন্ধুর বাড়িতে কাটাতে হল। নিজের ঘরে ঢোকার সৌভাগ্য হল স্ত্রী বাড়ি ফেরার পরে। ততদিনে অবশ্য ইঞ্চিখানেক চুল গজিয়েছে ন্যাড়া মাথায়।

রোবি অবশ্য এ ক'দিন বাড়ি ঘর ঠিকমতোই সামলে রেখেছে। পরে শুনেছি টিভি দেখে সে বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে। অবশ্য এই একমাসে ওর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও হয়েছে যথেষ্ট। নিজেস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারটি সে ইদানিং খুব পরিস্কারভাবে প্রকাশ করে। আমার স্ত্রী ওকে বিদেশী ভাষা অনুবাদ শেখাতে চেয়েছিল। ফরাসী-রোমান অভিধান কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে রোবি, বটতলার পেপারব্যাকও গোগ্রাসে গিলেছে। কিন্তু অনুবাদ করার কথা বললে সে বিরক্ত গলায় বলেছে:

'অনুবাদে কোনো মজা নেই। ইচ্ছে হলে নিজেই কাজটা করুন না!'

রোবিকে আমি দাবা খেলা শিখিয়েছি। প্রথমদিকে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু যেদিন থেকে ওর মাথায় যৌক্তিক বিশ্লেষণের ব্যাপারটি ঢুকল, উল্টোপাল্টা কাজ শুরু করে দিল সে। তারপর একসময় দাবার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সে, ঝুঁকে পড়ল কবিতার দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসিক কবিতার মাঝে ছন্দ বানান বৈশিষ্ট্যে ভুল খুঁজে বেড়াল। তেমন কিছু চোখে পড়লে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে তুলতে লাগল সে।

যতদিন যেতে লাগল বেপরোয়া হয়ে উঠল রোবি, উপদ্রব বেড়ে গেল তার। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বিরক্তিকর উপাদানটাকে ঘাড় ধরে রাস্তায় বের করে দেই। কিন্তু পারি না। পারি না আমার শ্বাশুড়ির ভয়ে। কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে রোবিকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি। তাঁর এবং রোবির মাঝে ভালোবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই বন্ধন ছিন্ন করার মতো সাহস কোথায় আমার।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

ফ্লাওয়ার্স অব দ্য আর্থ

মিখাইল পুখভ

নির্জন করিডোরের শেষ মাথায় সিঁড়ির পাশে ঝোলান একটি প্লেটে লেখা রয়েছে "ইনস্টিটিউটের পরিচালক"। দরজাটা ঠেলে খুলল চেরনভ। বড় জানালা পথে বাইরের দিকে তাকাল সে। কিছু গাছের মাঝ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে চার্চের চুঁড়োর আবছা অবয়বগুলো। কালো কাচের আড়ালে জানালার সামনের টেবিলটাতে বসে আছে এক অল্পবয়স্ক লোক। নিরুৎসাহী দৃষ্টিতে চেরনভের দিকে তাকাল সে।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি পরিচালকের সাথে কথা বলতে চাই।'

'আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?' আবার বলল লোকটা।

চেরনভ একটু দেরি করে বুঝতে পারল যে এই রুমে ঢোকার একটিই মাত্র দরজা এবং সেই দরজা দিয়েই সে ভেতরে ঢুকেছে।

'আপনি কি এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক?'

'পরিচালক বাইরে গেছেন। এখন ছুটির সময়। সবাই বাইরে। গরমের উত্তাপ, আপনি জানেন। আমি তাঁর সহকারী। আমার নাম বুনিয়াক।' হ্যান্ডশেকের জন্য হাত না বাড়িয়েই নিজের পরিচয় দিল সে। 'বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?'

কিছু বলল না চেরনভ।

'বসুন,' বুনিয়াক বলল।

দর্শনার্থীদের জন্য রাখা চেয়ারে বসল চেরনভ। বুনিয়াকের মুখে বন্ধুত্বের কোনো আভাস দেখতে পেল না।

'আপনি কি চাকরি খুঁজছেন?'

কথা না বলে তার দিকে তাকাল চেরনভ। লোকটা খুবই তরুণ এবং এর মধ্যেই সে সহকারী পরিচালক হয়েছে। অবশ্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক। এদিক থেকে বিচার করলে, এখন প্রত্যেকেই তরুণ এবং উচ্চাভিলাষী।

অপেক্ষা করতে লাগল বুনিয়াক।

'না,' অবশেষে বলল চেরনভ। 'আমি একজন মহাকাশচারী। আমি...'

'বলার দরকার নেই, আমি সবই জানি।'

বুনিয়াক একটা সুইচ টিপল। তাকাল একটা স্ক্রিনের দিকে, চেরনভ সেটা দেখতে পাচ্ছে না।

'চেরনভ, আনাতলি ভ্যাসিলিয়েভিচ। জাতীয়তা: রাশিয়ান। জন্ম তারিখ: ১৯৯৬। পেশা: মহাকাশচারী। পৃথিবী ছেড়েছেন ২০২০ সালে। ফিরেছেন এক মাস আগে। তাঁরা অবশ্যই আপনাকে বলেছেন যে প্রত্যেকেই তার সাথে নিজের বায়ো-স্কেচ সাথে রাখবেন।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সেটা ছিল কেবল একটা নাম্বার। কিছু সংখ্যার সমন্বয়, এর বেশি কিছু না।'

'হ্যাঁ,' হাসল বুনিয়াক। 'এরকম কিছু ছোট যন্ত্র সব জায়গাতে বসান হয়েছিল। এটাতে আপনার নাম্বার নথিভুক্ত ছিল। এটাতে পৃথিবীর সব নাগরিকেরই তথ্য ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আপনি এখানে তার বিস্তারিত কিছু শোনার জন্য তখন আসেন নি।'

'না,' বলল চেরনভ।

বুনিয়াক অপেক্ষা করতে লাগল।

'একটা বাজে ভ্রমণের পরে আমি ফিরে এসেছি,' বলল চেরনভ। 'ততদিনে পৃথিবীতে দু'শ বছর কেটে গেছে। যারা আমাদের দেখেছিল তারা আজ মৃত।'

'বুঝতে পারছি,' বলল বুনিয়াক।

'আমি চলে যাবার সময় ওরা আমাকে কৌশলগত কোর্স শিকিয়েছিল যাতে আমি ফিরে আসতে পারি।'

'হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক অনুশীলন,' মাথা নেড়ে সায় দিল বুনিয়াক।

'ঐ বক্তৃতা থেকে আমি শিখেছিলাম আধুনিক বিজ্ঞান এমন অনেক কিছুই করতে পারে যেসব আমরা স্বপ্নেও করতে পারিনা।'

'অবাক হবার কিছু নেই। পুরো দু'শ বছর পার হয়েছে,' বলল বুনিয়াক।

'আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমাধান জেনেছি। তারা ক্যান্সারের চিকিৎসা আবিষ্কার করেছে। আরোগ্য হবে না এমন কোনো অসুখ নেই। বিজ্ঞান মানুষের অমরত্বের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বুনিয়াক।

'আমি বুঝতে পারছি, মৃত দেহকে আবার জীবিত করতে একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।'

চুপ করে থাকল বুনিয়াক, তার চোখ দুটো কালো গ্লাসের আড়ালে লুকান।

'আমি বলছি তারা এখানে রিঅ্যানিমেশন ইনস্টিটিউটে এই কাজটি করে,' বলে চলল চেরনভ। 'তারা বলেছে আপনি মৃত দেহের ধ্বংসাবশেষ থেকে তা পুনরুজ্জীবিত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারেন।'

'হ্যাঁ, এমনকি ফসিল থেকেও,' বলল বুনিয়াক। 'একটি অঙ্গের প্রতিটি কোষ সেই অঙ্গের পুরো তথ্য বহন করে। আমাদের পদ্ধতিতে পুনর্জীবিত করার দুটো স্তর রয়েছে। সবচেয়ে জটিল বিষয় হল কোষকে পুনর্জীবিত করা। দ্বিতীয় স্তর হল এটা থেকে অঙ্গটিকে আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এটা পরিশ্রম–এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু মৌলিকভাবে সহজ। এই পদ্ধতিটা আমরা প্রাথমিক ম্যামথকে পুনর্জীবিত করতে ব্যবহার করেছি যারা এখন অ্যানটার্কটিকে বাস করছে।'

থামল বুনিয়াক। কথা বলার আগে দীর্ঘসময় নিল চেরনভ।

'ম্যামথ। আমি বুঝতে পারছি না পুনর্জীবিত করার জন্য মূল্যবান বস্তু কি আপনাদের কাছে নেই?'

'কী বলতে চাইছেন?'

'মানব দেহ। আপনার কথা থেকে জানতে পারলাম, আপনারা কেবলমাত্র লুপ্ত দানবগুলোকে পুনর্জীবিত করছেন। এটাই আমাকে বিচলিত করেছে পুনর্জীবিত করার প্রকৃত ঘটনার চেয়ে বেশি। নাকি আমার কিছু বুঝতে ভুল হয়েছে?'

কোনো উত্তর দিল না বুনিয়াক।

'আমি ফিরে আসার পর মাত্র এক মাস কেটেছে,' বলল চেরনভ। 'আমি

এখানের অনেক কিছুই পছন্দ করিনা। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পুনর্জীবিত ম্যামথ... যদি আমাকে বলেন আমি বলব এটা নিছক ভুল ধারণা, আমি যাচ্ছি।'

কাঁচ সরাল বুনিয়াক। তার চোখদুটো ক্লান্ত যা তরুণদের বেলায় দেখা যায় না।

'হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে শক্তির দরকার হয়, বিপুল পরিমাণ শক্তি।'

'ম্যামথগুলোর চেয়েও?'

'ম্যামথগুলো ছিল সহজ কাজ,' বলল বুনিয়াক। 'তারা পরামর্শ দিয়েছিল যে আমরা যেন কিছু প্রাণী পুনরুজ্জীবিত করি, একটি পুরুষ জাতীয় প্রাণী এবং কিছু স্ত্রীজাতীয় প্রাণী। মানুষ হল সম্পূর্ণ আলাদ বিষয়। এখানে নীতিগত সমস্যা রয়েছে যেখানে জীববিদ্যার কিছু করার নেই।'

চেরনভ তাকাল বুনিয়াকের পেছনের জানালা দিয়ে দূরবর্তী চূড়াগুলোর দিকে।

'সময়মতো কোষগুলো কিছু অপরিবর্তনীয়ভাবে বাড়তে থাকে,' বলে চলল বুনিয়াক। 'মানুষের বেলায়, একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমার (প্রায় ত্রিশ বছর) উর্ধ্বে পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভব। যদি তার মৃত্যু দেরিতে ঘটে, তাহলে আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। যদিও ঘটনাটি সেরকম, কয়েক বিলিয়ন প্রার্থী রয়েছে। তাই আমাদের নির্বাচন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।'

চুপ করে রইল চেরনভ।

'ব্যাপকহারে পুনর্জীবন দান অচিন্তনীয় ব্যাপার, কারণ শক্তি সীমিত। বেছে নেবার ব্যাপারগুলোও অসম্ভব কাজ। নৈতিক সমস্যা বিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপারের চেয়ে বেশি জটিল। এ প্রশ্নটি আপনিই প্রথম করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। আমার স্থানে নিজেকে বসানর চেষ্টা করুন তারপর দেখুন।'

'না,' বলল চেরনভ। 'আপনি আমার সম্পর্কে সবকিছু জানেন না। আমি একা ফিরে এসেছি।'

বুনিয়াক অপেক্ষা করতে লাগল।

'আমরা ছিলাম দু'জন,' বলে চলল চেরনভ। 'নভোযানটা পাঁচ বছর উড়ছিল। যে গ্রহটিতে আমরা পৌঁছেছিলাম তার আবহাওয়া ছিল আমাদের

মানদণ্ডে বিষাক্ত। কিন্তু সেটা জীবনের আদিম ধরনের জন্য সহনীয়। আমরা উপর থেকে সেসব প্রমাণ করি।'

মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল বুনিয়াক।

'প্রথম প্রজন্মের সব নভোযানের মতো আমাদের নভোযানটিতে কোনো চাকা বা ল্যানডিং গিয়ার ছিল না। এটাতে ছিল সীমিত দক্ষতার এক আসনের ল্যানডিং ক্র্যাফ্‌ট। পরিকল্পনা মতো আমার সহকর্মী ক্র্যাফ্‌টটাতে আরোহন করল, আর আমরা পৃথক হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত চিরকালের জন্য।'

বুনিয়াকের চেহারায় পরিবর্তন ফুটে উঠল।

'আপনি ধারণা করতে পারেন যে ল্যানডিং ক্র্যাফ্‌টটা বিধ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু মানুষটা বেঁচে যায়। পরীক্ষা চালিয়ে যায় সে, আর ফলাফল আমার কাছে পাঠায়। যখন তথ্য প্রদানের গতি কমতে শুরু করল আমরা বুঝতে পারলাম যে ল্যানডিং ক্র্যাফ্‌টা মেরামতের উর্ধ্বে চলে গেছে। পরস্পরকে আমরা বিদায় জানালাম, আর আমি রওনা দিলাম পৃথিবীর দিকে।'

'আর সে?'

'কোনোভাবেই আমি তাকে সাহায্য করতে পারলাম না,' চেরনভ বলে চলল। 'আমাদের দুজনের কাছেই মনে হয়েছিল যে গ্রহটির জীবমণ্ডল সম্পর্কে তথ্যটি পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরী বিষয়। হ্যাঁ, ওটাই ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

কিছু বলল না বুনিয়াক।

'আমরা পৃথিবীর দায়িত্ব পালন করছিলাম,' বলে চলল চেরনভ। 'এটা ছিল আমার জন্য এক কঠিন সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি অন্য কিছু করতে পারিনি। এখন আমি অনেক মানুষে মধ্যে একজন, যে এই তথ্য সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজন মনে করে না, আমার পুনর্বিবেচনা রয়েছে। কিন্তু সেই সময়ে আমাদের কাছে এটাই একমাত্র সঠিক পথ বলে মনে হয়েছিল।'

'এখন আমার বিষয়গুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে,' আবার বলতে লাগল চেরনভ। 'সম্ভবত সে জানতো এটা কী। আমার কল্যাণের জন্য সে সম্ভবত স্রেফ অজুহাত দিচ্ছিল। সত্যি হলো আমি তাকে ছেড়ে এসেছিলাম...'

'ওকথা চিন্তা করে কষ্ট পাবেন না,' বলল বুনিয়াক। 'আপনার জীবনে ওটা সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়। তার ভাগ্য নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু আপনার কোনো

ক্ষমতা ছিল না।'

জবাব দিল না চেরনভ। সে জানালার বাইরে বৃক্ষরাজির ফাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল।

'প্রতিকুল পরিবেশে সবাই ক্ষমতাহীন,' আবার বলতে লাগল বুনিয়াক। 'আমরাও ক্ষমতাহীন।'

'না, আমি একমত নই। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য, কিন্তু আমি একমত নই,' বলল চেরনভ। 'আচ্ছা বেশ, মানবজাতি আমাদের কাছে একটুও ঋণী নয়। আমার বন্ধু লাখ লাখ মানুষের মধ্যে স্রেফ একজন। আমি আপনার একথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সেখানে অন্যরা ছিলেন।'

'কে?'

'সর্বকালে প্রচুর মহানব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের ছাড়া আমাদের জগত কখনো পূর্ণতা লাভ করেনি। তাঁরা না থাকলে এই জগত আরো বেশি নিকৃষ্ট হয়ে উঠত।'

'বয়সের সীমারেখা ভুলবেন না,' বুনিয়াক মনে করিয়ে দিল তাকে। 'ত্রিশ বছরের চেয়ে বেশি বয়সী নয়।'

'তা সত্ত্বেও। সেখানে লারমনটভ ছিলেন, গ্যালোইস... প্রচুর মানুষ।'

'ঠিক', বলল বুনিয়াক। 'এ কারণে বিষয়টা এত জটিল হয়েছে।'

'প্রশ্নই ওঠে না। এটা শুধু কেবলমাত্র তাই যা আপনি...' চেরনভ শব্দ খুঁজতে লাগল। 'আপনি কিছুই মনে রাখেন নি।'

বুনিয়াক উত্তর দিল না। সে দূরবর্তী আকাশের দিকে পেছন ফিরে নিশ্চল বসে আছে। তার চোখ দুটোতে ক্লান্তি। এবার উঠে দাঁড়াল সে।

'ঠিক বলেছেন। আমরা কিছুই মনে রাখিনি,' বলল সে। 'আসুন আমার সাথে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে তারা ফিতার মতো টাওয়ারের উপর সরু প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল, তাকাল নিচের ফুলের সমুদ্রের পানে। চেরনভ টের পেল না কীভাবে তারা পৌছল, সে তারপর বেয়ারিংগুলো হারিয়েছে। সে মনে করতে পারল যে তারা ইনস্টিটিউট বিল্ডিংটা থেকে বেরোল, তারপর দীর্ঘপথ হাঁটল তরুসজ্জিত পথ ধরে, আর তারপর পেঁচান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল।

তাদের নিচে দৃষ্টির পথে বিস্তৃত সবুজ সমুদ্র। এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে

বিশাল তুষার খণ্ড। গাছের চূড়ার উপর দিয়ে ঢেউ খেলে শহর ও ব্রিজে বয়ে যাচ্ছে প্রচুর বাতাস। দূরে একটি পাতলা তিনকোনা পাইপ। শব্দহীন এক বস্তু তাতে চড়ে বেড়াচ্ছে তীব্র বেগে।

'মনোর,' ব্যাখ্যা করল বুনিয়াক। 'মনোরেল ট্রেন। এটাই এখন সাধারণ জনগণের প্রধান বাহন।'

একটি লম্বা রেলগাড়ি না থেমেই ছুটে যাচ্ছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে বাতাসের ঝাপটা।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইল চেরনভ।

'সেটা কোনো বিষয় নয়,' বুনিয়াক এক চিলতে হাসল। 'আমি মনে করি না এর মধ্যে অন্যকোনো ব্যাপার আছে।'

পরবর্তী গাড়িটা হালকাভাবে এসে থামল। গাড়িটার দেয়াল পেছন দিকে হেলান। ওরা চড়ে বসল সেটাতে। সবুজ পথের উপর দিয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন। সারা শহর জুড়ে সাদা দালানগুলোর পাশে ট্রেনের চলে যাবার চিহ্নগুলো ফুটে উঠছিল।

'আমি জানতে চাইছি, আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন,' জোরগলায় বলল চেরনভ।

'আপনি ভাবতে পারেন যে আমাদের কিছুই মনে নেই, আর আপনি বুঝতে চাইছেন না কেন আমরা মানুষ নিয়ে কাজ করি না। আমি আপনাকে বোঝাতে সাহায্য করব। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা যেখানে যাচ্ছি তার সাথে এর পার্থক্য নেই।'

চেরনভ বিষণ্ন চোখে যাত্রীদের জরিপ করল। সে আবিষ্কার করল যে যাত্রীদের সবাই দেখতে অল্পবয়স্ক নারী। সবার পরনের শর্ট স্কার্টগুলোর রংও একই, গোলাপি। নারীগুলো তাদের হাঁটু লুকিয়ে রেখেছে ফুলের তোড়ার আড়ালে। তাদের অচেনা সৌরভে ভরে উঠেছে বাতাস। জোরে ছুটে চলছে গাড়িটা, মাঝে মাঝে থামছে।

'আমি বুঝতে পারছি না তাদের এত ফুলের দরকার হল কেন,' বলল চেরনভ। 'তারাকি আদৌ কাজ করে? এখন দুপুর। আর রাস্তাগুলোতে বেকারদের ভিড়। তারা কি কোনো কাজই করে না?'

শহরের বাইরে টার্মিনাল। গাড়িটা সেদিকেই এগোচ্ছে থামার জন্য। মাটির কাছে এসে পুরোপুরি থেমে গেল। ফুল পরিহিত মেয়েগুলো হোঁচট খেতে

খেতে নামল। তারা জঙ্গল এবং মাঠের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। ফিরে চলল বুনিয়াক এবং চেরনভ। পথটা লম্বা পাইন গাছগুলোর সাথে উঠে গেছে উপরে। মাঠের ফসল পেকে গেছে।

'এখন গরমের সময়,' বলল বুনিয়াক। 'আমি আপনাকে বলেছি যে লোকজন ছুটি কাটাচ্ছে। বিরক্ত হবেন না।'

পথের চড়াই শেষ হল। পথের শেষ বাঁকটাতে থামল বুনিয়াক, কিন্তু মেয়েদের দলটা হেঁটে গেল লম্বা গাছগুলোর নিচে বিছান একটা সাধারণ পাথরখণ্ডের দিকে। এর পরেই রয়েছে অনির্বাণ অগ্নিশিখা।

'বিরক্ত হবেন না,' বলল বুনিয়াক। 'সব মনোরেল-এর পথ শেষ হয়েছে এরকম স্থানে। প্রতিটি স্থানে যেখানে যুদ্ধ হয়েছে সেখানকার মাটিতে মিশে আছে মৃতের ধ্বংসাবশেষ। এর প্রতি একমুঠ থেকে আমরা একজন মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি। এরকম এককোটি রয়েছে। এদের বেশিরভাগই শিশু। এদের নিয়ে মানবজাতির জন্য কিছুই করার নেই। প্রধান বিষয়টি ছাড়া। এখন বুঝতে পারছেন তো আমাদের অবস্থাটা?'

নীরব হয়ে গেল সে। চেরনভও নীরব রইল। ভিন্ন দুই সময়ের দুটি মানুষ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কালো পাথরের উপর ফুলের ঢিপি তৈরি হয়েছে। মেয়েরা গোলাপ সজ্জিত পোশাক পরে শূন্য হাতে চলে যেতে লাগল।

অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল

গুডবাই, মারশিয়ান!

রোমেন ইয়ারভ

প্রথমে সে উঁকি দিল বেড়ার ফাঁক দিয়ে, তারপর উ ঠ দাঁড়াল লাফ মেরে, বেড়ার ছুঁচোল খোঁটাগুলো আঁকড়ে ধরে উঠে গেল ওপরে। বসে গেল আনুভূমিক রেইলটার ওপর। ইতোমধ্যে রাত নেমে গেছে। দিগন্তের ওপারের আকাশ থেকে মুছে গেছে গোধূলির শেষ চিহ্নটুকু। ছেলেটা তার চোখ দুটো বন্ধ করতেই সামনের রাস্তাটা ল্যান্ডিং স্টিপের মতো ছড়িয়ে যেতে লাগল এবং সে দেখতে পেল সবুজ বনটা। চোখ খুলতেই আবার সব হারিয়ে গেল অন্ধকারে। শান্ত নিঝুম এই চরাচরে শুধু একটা জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে আলোর চিহ্ন। বাড়িটা রয়েছে পাহাড়ের ওপর এবং নিচের দিকে দূরে কোথাও এক বিন্দুতে মিলেছে বন, আকাশ আর সরু পথটা, সেখানেই দেখা যাচ্ছে আগুন। হলুদ শিখার বিশাল অগ্নিকুণ্ড একটা। সেটাকে গবলিটের কানার মতো ঘিরে আছে অন্ধকার। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুনটা এগিয়ে আসছে ওপরের দিকে, ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে।

পেছনে তাকাল ছেলেটি। আঁধারের অস্পষ্টতার মাঝেও দিব্যি ফুটে আছে বাড়িটার আদল। এজন্যে এক ধরনের নিশ্চয়তা অনুভব করছে সে। একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল তার, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা এয়ারক্র্যাফ্‌ট। ছেলেটি সাগ্রহে তাকাল দূরের আগুনের দিকে। তারপর লাফিয়ে পড়ল বেড়া থেকে, যতদূর সম্ভব শব্দ না করার চেষ্টা করল।

গ্রামের শেষ বাড়ি এটা এবং এখান থেকেই পাহাড়ের ঢাল শুরু। মাটির ওপরের ধুলো ঠান্ডা হলেও সারাদিন রোদের আঁচে পোড়া ভেতরের ধুলো গরম

রয়ে গেছে এখনো। এই আবিষ্কার আনন্দ দিল ছেলেটিকে, ধুলোর ভেতর যত দূর পারল পায়ের পাতা ডুবিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটল খানিকক্ষণ। তারপর অকস্মাৎ সে অবাক হয়ে গেল—এ কোথায় এসে পড়েছে। ছেলেটি যখন পেছন ফিরে তাকাল, পাহাড়ের চুড়ো কিংবা সেই বাড়িটা দেখতে পেল না। এমনকি অন্যান্য উঁচু বাড়িগুলোও চোখে পড়ল না। সামনের আগুনটাও দেখা যাচ্ছে না আর। আরেকটা পাহাড় ঢেকে ফেলেছে আগুন। ছেলেটি থামল। তাকাল আকাশের দিকে। ছোট ছোট তারাগুলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে আকাশে। চকচকে নতুন স্বচ্ছ কাগজের মতো লাগছে ভেজা ভেজা আকাশটাকে। সহসা বড় শহরটার সেই পাতলা কাঁচের মতো আকাশটার কথা মনে পড়ে গেল তার। নিজের পথটা নিয়ে আর কোনো দ্বিধা রইল না। আবার পা বাড়াল সামনের দিকে। মঙ্গলগ্রহ খুঁজে পাওয়ার প্রবল আগ্রহ নিয়ে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল ওপরের দিকে।

সেই উষ্ণতা আর অনুভব করছে না ছেলেটি, তবে তীব্র একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে শুকনো ধোঁয়ার। প্রতি মুহূর্তে সে আশা করছে—এখুনি গাছগুলোর ওপাশের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে কোনো জ্বলন্ত মশাল। অনেকটা পথ চড়াই-উতরাই ভেঙে আসায় ক্লান্ত ছেলেটি। রাতের নিঝুম বনটা এখন ভয়াল দেখাচ্ছে। দেবদারুর পাতাবহুল ডালগুলো ঢেকে রেখেছে আকাশ। গাছের নিচু ডালপালা, কাঁটাঝোপ আর গ্রন্থিল শেকড় বনটাকে করে তুলেছে দুর্গম। দরদরিয়ে ঘাম নামছে ছেলেটির মুখে, গড়িয়ে যাচ্ছে খোলা শার্টের কলার দিয়ে।

একটা গাছের উষ্ণ গুঁড়িতে হাত রেখে খোলা জায়গাটার প্রান্তে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটি। তিনতলা সমান উঁচু একটা গোলগাল পিণ্ড রয়েছে খোলা জায়গাটার একদম মাঝখানে, এবং জ্বলছে। এখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে খোলা জায়গার প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়ান ঝোপগুলো থেকে, পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে জ্বলন্ত পিণ্ডটার দিকে ঝুঁলে থাকা ডালগুলো। তবে আর কোথাও কোনো আগুন নেই।

'একটি আন্তঃগ্রহ স্পেসক্র্যাফটও পুড়ে যেতে পারে এই আবহাওয়ায়,' আপন মনে বলে উঠল ছেলেটি।

দ্রুত শীতল হয়ে আসছে গোলগাল পিণ্ডটা। পাহাড়ের চুড়ো থেকে তখন মনে হয়েছে, কমলা রঙের একটা কিছু জ্বলছে এখানে, নির্দিষ্ট কোনো আকার

ছিল না। এখন বিবর্ণ গোলাপী রঙ ধরেছে, এবং রঙটা বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। খুব বেশিদিন হয়নি একটা কারখানা ঘুরে এসেছে ছেলেটি। সেখানে হাপরের চুল্লী থেকে উত্তপ্ত ধাতব টুকরোগুলো বের করে ঠিক এভাবেই শীতল করা হত। পিণ্ডটার বাইরের দিকটা জ্বলজ্বলে ভাব থেকে ক্রমশ অনুজ্জ্বল হয়ে এল। সেই সঙ্গে নীলচে দাগ তৈরি হতে লাগল ওটার গায়ে। দাগগুলো একটার সাথে লেগে যাচ্ছে আরেকটা। শেষমেষ জ্বলজ্বলে গোলাপী আভা সরে গেল একদম এবং পিণ্ডটা ডুবে গেল অন্ধকারে।

একটা সার্চলাইট জ্বলে উঠল গোলকটার শীর্ষে। বিশাল ব্যাসার্ধ নিয়ে ঘুরতে লাগল ওটা। আলোটা ক্রমশ এগিয়ে এল ছেলেটির দিকে, কিন্তু ছেলেটি নড়ল না। এমনকি আলোটা ছেলেটির ওপর স্থির হওয়ার পরেও অনড় রইল সে। গোলকের একপাশে একটা ফাটল দেখা গেল। দ্রুত বড় হল ফাটলটা। ছেলেটি বুঝতে পারল, হ্যাচ খুলে গেল একটা। ভেতর থেকে আসা আলোতে আলোকিত ওই ফোকরটা। একটা মই বেরিয়ে এল ফোকর দিয়ে, ধীরে ধীরে মইটা ভাঁজ খুলে নেমে এল মাটিতে।

'এ তো, গ্যাঙওয়ে বেরিয়ে এসেছে,' মনে মনে ভাবল ছেলেটি। এগিয়ে গিয়ে মইয়ের প্রান্তটা ধরল সে। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, এইমাত্র নেমে এসেছে মইটা। বেশ মজবুত এটা।

ফোকরের ভেতর আলোটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবং একটা কাঠামো দেখা গেল ফোকরে। ধীরে ধীরে গ্যাঙওয়ে ধরে নামতে লাগল কাঠামোটা। কাঠামোর আদলটা মানুষের মতো খাড়া, মানুষের হাতের মতো হাতও আছে দুটো, সেগুলো ঝুলছে শরীরের দু'পাশে। কিন্তু আগন্তুকের মুখটা পছন্দ হল না ছেলেটির। মুখভর্তি কেমন দলা পাকান একটা ভাব, সেই সঙ্গে ভাঁজও রয়েছে প্রচুর। মোটেও মানুষের মতো নয় চেহারাটা। গ্যাঙওয়ের একদম নিচে এসে থামল সে। যেন কিছু একটা তলিয়ে দেখতে চাইছে। তারপর নেমে এল পৃথিবীর মাটিতে, মুখোশটা সরিয়ে নিল মুখ থেকে।

'এই নিরাপদ অবতরণের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ,' বন্ধুসুলভ হাসি নিয়ে বলল ছেলেটি। 'আমি জানি, কেন এই বিচ্ছিরি স্পেস-স্যুট পরেছেন আপনি। একবার এক বইয়ে বাদুড়দের সম্পর্কে পড়েছিলাম—এদেরও এই একইরকম ভাঁজ রয়েছে। এজন্যেই আঁধারে পথ খুঁজে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না ওদের। এক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে আলট্রাসোনিকস।'

আগন্তুক নিঃশব্দে মেপে নিল ছেলেটিকে। আগন্তুকের বড় বড় চোখ দুটো মানুষের চোখের প্রায় দ্বিগুণ, তবে দৃষ্টিটা মাধুর্যপূর্ণ।

'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' ছেলেটি জিজ্ঞেস করল তাকে।

পকেট থেকে বাহু ব্যবহৃত মহাকাশের একটি ম্যাপ বের করে দেখাল ছেলেটি। ম্যাপটার দিকে আগন্তুক এক ঝলক তাকিয়ে যাদুকরের মতো একটা জিনিস মেলে ধরল তার হাতের তালুতে। পরে জিনিসটা দিয়ে দিল ছেলেটিকে। সৌরজগতের ত্রি-মাত্রিক মডেল এটা। তবে মডেলটার ভেতর যা ঘটেছে, সে এক অকল্পনীয় ব্যাপার। স্বচ্ছ বাক্সটার ভেতর একের পর এক নিখুঁতবাবে স্থাপন করা হয়েছে সব গ্রহ। গ্রহগুলো আপন কক্ষপথ ধরে ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। সূর্যকে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় পৃথিবীকে পেয়ে গেল ছেলেটি। অবাক হয়ে গেল দূর গ্রহের দূরবীণের ক্ষমতা দেখে। ওরা এতদূর থেকে ঠিকই দেখে নিয়েছে পৃথিবীর সব কিছু। তারপর মডেলটার ভেতর নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে মহাদেশ এবং মহাসাগরগুলোর অবস্থান। এমনকি বড় বড় শহরগুলোর চিহ্নও রয়েছে পৃথিবীর বুকে। আগন্তুকের লম্বা আর সরু একটি আঙুল এসে স্থির হল মঙ্গলগ্রহের দিকে।

'ও, আপনি মঙ্গলগ্রহবাসী!' আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল ছেলেটি। 'আমিও কিন্তু এমনটিই ভেবেছিলাম। যাকগে, চলুন—পরিচয়টা হয়ে যাক! আমি হচ্ছি সাশা, একজন পৃথিবীবাসী।' নিজের দিকে আঙুল তাক করল ছেলেটি।

মঙ্গলগ্রহবাসীও নিজের দিকে একইরকম ইঙ্গিত করে বলল, 'আমি ওড।'

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল সাশা। মঙ্গলগ্রহবাসীর আঙুলগুলো বড় বড় হলেও কোনো ব্যথা পেল না সে। মঙ্গলগ্রহবাসীকে বলল, 'শুনুন, আশেপাশের লোকজন শিগ্রী জেনে যাবে আপনার এখানে আসার খবর। তারা অবশ্যই আপনার স্পেসশিপ নেমে আসতে দেখেছে—এবং এটাকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ড বলে ভাববে না কেউ। হয়তোবা ইতোমধ্যে আপনার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে তারা—শুনতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের শব্দ? কিন্তু গাছগাছালির জন্যে কিছু দেখতে পাবে না তারা। কাছেই টেলিগ্রাফ অফিসসহ একটা গ্রাম রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন লোকের বাস।'

পকেট থেকে পেন্সিলের মতো কিছু একটা বের করল ছেলেটি। ম্যাপের উল্টো পিঠে লিখল, 'বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির লোকজন ছাড়া আর কেউ ধরবে না এটা।'

নোটটা কাছের এক ঝোপে কাঁটায় গেঁথে রাখল ছেলেটি। তারপর

শেষবারের মতো খোলা জায়গাটার দিকে তাকাল সে, সেখানে ঘটে গেছে তার জীবনের সবচে' বিস্ময়কর ঘটনা। ক্ষণিকের জন্যে কল্পনায় সওয়ার হল ছেলেটি। অন্ধকার গাছগুলো ভাগ ভাগ হয়ে সরে গেল চোখের সামনে থেকে। বিশ্বের বড় বড় শহরগুলো দেখতে পেল সে, চারদিকে লোকজন সব ছুটোছুটি করছে তুমুল উত্তেজনা নিয়ে।

মঙ্গলবাসীর হাতের ইশারায় ভাঁজ হয়ে গুটিয়ে গেল গ্যাঙওয়ে। বন্ধ হয়ে গেল খোলা মুখটা। নিভে গেল গোলকটির উপরের আলো।

'আমরা খুব শিগ্রী ফিরে আসব,' এই বলে রওনা হল ছেলেটি, তাকে অনুসরণ করতে লাগল মঙ্গলবাসী। মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা বয়ে চলেছে ছেলেটির।

যখন সে এদিকে দৌড়ে এসেছে, কোনো দিকে খেয়াল ছিল না তার। কাজেই কাঁটা বা ছুঁচোল বাশের আঁচড় খেয়েও মালুম হয়নি। কিন্তু এখন পথ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত খুব সাবধানে এগোতে হবে, তাহলে একটা কুটোও লাগবে না গায়ে। নিজের জন্যে নয়, মঙ্গলবাসীর জন্যেই বেশি উদ্বিগ্ন সে। কারণ এই ভিনগ্রহবাসী পৃথিবীর অতিথি। মনে মনে ছেলেটি বলল—'আহ! তোমাকে আমার কি যে ভালো লাগছে, মারশিয়ান! তোমার জন্যে কি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি আমি! আমার বিশ্বাস এর আগেও আমাদের এখানে একবার এসেছ তুমি, তবে তোমার মতো সমপর্যায়ের কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে দেখা হয়নি, তারপর ফিরে গেছো আবার। এখন আবার তুমি এখানে! তুমি মোটেও নির্দয় নও, মারশিয়ান, বরং দয়াবান। তুমি আমাদের কোনো কিছু ধ্বংস করবে না এবং আমাদের জয় করারও চেষ্টা চালাবে না, কারণ তুমি নিজেও জান, তুমি অত্যন্ত উঁচু মানের একটা প্রাণী। তোমার জন্যে আমি কি যে অপেক্ষা করেছি, মঙ্গলবাসী! তুমি যদি এখানে এভাবে না এসে পৌঁছুতে, আমাকেই পথ করে নিতে হত তোমার কাছে যাওয়ার জন্যে। দশ, পনেরো, কিংবা বিশ বছর—যত সময়ই লাগুক না কেন, আমি ঠিক পৌঁছে যেতাম তোমার কাছে। হয়তোবা আমরা দু'জন একসঙ্গে উড়ে যাব অন্য কোনো ছায়াপথে।'

আগে আগে এগিয়ে চলেছে ছেলেটি, পেছনে তাকে অনুসরণ করছে মঙ্গলবাসী। ভিনগ্রহের এই অতিথি যাতে ডালপালা বা শেকড়ে জড়িয়ে হোঁচট না খায়, এজন্যে পথ পরিস্কার করে দিচ্ছে ছেলেটি। ইতোমধ্যে আলোর দেখা মিলেছে, সে আলোতে চিক্‌চিক্ করছে ঝরে পড়া শিশির, পাখিরা সুর তুলে

ডাকছে এবং বনের গভীর খাদগুলো থেকে উঠে আসছে কুয়াশা। পৃথিবীর রূপ, সৌরভ আর শব্দের ছন্দে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, তা দেখার জন্যে মঙ্গলবাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটি।

বনটার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে তিনটে হেলিকপ্টার। মঙ্গলবাসী আর ছেলেটি বন থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র নিচে নামতে লাগল হেলিকপ্টার তিনটি। দড়ির মই বেরিয়ে এল হেলিকপ্টার থেকে। মই বেয়ে নিচে নেমে এল লোকজন। ক'জন সিভিলিয়ান এবং মিলিটারিম্যান। প্রথম যিনি নামলেন, তাঁর মাথায় কালো ক্যাপ দেখে বোঝা গেল, তিনি একজন অ্যাকাডেমিসিয়ান। তার ধূসর ঝুপো দাড়ি বাঁক ধরেছে বাতাসে। মঙ্গলবাসীর হাত ধরে সামনের দিকে ছুটল ছেলেটি।

'এই যে, ইনি একজন মঙ্গলবাসী!' সবার সাথে ভিনগ্রহের অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিল ছেলেটি। অ্যাকাডেমিসিয়ান মাথার ক্যাপ তুলে স্বাগত জানালেন তাকে, সামরিক সদস্যরা স্যালুট করল, ক্লিক্ ক্লিক্ করে উঠল ক্যামেরা।

'তাঁর স্পেসশিপটি বনের ভেতর আছে,' বলল ছেলেটি। 'রাতের আঁধারে আলো দেখেছি ওটার।'

'লক্ষ্মী ছেলে!' বললেন অ্যাকাডেমিসিয়ান। মলাটে সোনালী অক্ষরে লেখা একটা নোট বই বের করলেন তিনি। 'তোমার নাম-ঠিকানা বল তো, বাবা? পত্রিকাগুলোতে দিয়ে দেব খবরটা। আগামীকাল বিশাল কর্মকাণ্ড রয়েছে এখানে, ফোনে তোমাকে জানাব। আপাতত বাড়ি চলে যাও।'

মঙ্গলবাসীকে ইশারায় মইটা দেখালেন অ্যাকাডেমিসিয়ান। মঙ্গলবাসী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এগিয়ে গেল। অ্যাকাডেমিসিয়ান অনুসরণ করলেন তাকে, বাকিরাও ছুটে গেল হেলিকপ্টারগুলোর দিকে। হেলিকপ্টার তিনটির পাখাগুলো দ্রুত থেকে ক্রমশ দ্রুততর হল। তিনটি হেলিকপ্টারই একসঙ্গে উঠে গেল ঘাসছাওয়া মাটি থেকে। ছেলেটি ওপরের দিকে মাথা তুলে বলল, 'গুডবাই, মারশিয়ান! আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে! বিদায়!'

পুব আকাশে উঁকি দিয়েছে লাল সূর্য, সোজা সেদিকে এগোল হেলিকপ্টারগুলো। সূর্যটা বড় থেকে বড় হচ্ছে ক্রমশ। ঠিক যেন বিশাল কোনো আকাশযানের গোলাকার জানালা। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে হেলিকপ্টারের পাখাগুলোর চারপাশে লালচে একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে সূর্যের আলোতে।

খুব শিগ্রী একটা উদ্ধারকারী দল তৈরি হয়ে গেল। দু'জনের এই দলটি চলে গেল রাস্তার পাশে বনের ভেতর। বিভিন্ন দিকে ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল তারা। দিনটি চমৎকার। পরিষ্কার আকাশ। ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে রাস্তায় একটার পর একটা আসছে মাল বোঝাই লরী।

খুব বেশি খুঁজতে হল না তাদের। বনের সেই শেষ প্রান্তে পাওয়া গেল ছেলেটিকে। একটা ঝোপের নিচে ঘুমোচ্ছে সে। ঘাসের লম্বা ডগাগুলো দুলছে ঘুমন্ত শহুরে ছেলেটার ফ্যাকাশে মুখখানির ওপর। শর্টস-এর নিচে তার উদোম দু'পায়ে একগাদা আঁচড়ের চিহ্ন। হালকা চপ্পল দুটোতে ছাই লেগে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত চলছে ছেলেটির। ঘুমের ভেতর মোচড় খেল তার শরীর। সেই সঙ্গে সে গা চুলকাচ্ছে হাত দিয়ে। একজন ডাক্তার ঝুঁকে পড়লেন তার দিকে, উৎকর্ণ হয়ে কিছু একটা শুনলেন এক মুহূর্ত, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'সে ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই, ঘুমোচ্ছে শুধু।' উঁচু রাবার বুট পরা উদ্ধারকারীরা ছেলেটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল অনড়, সবাইকে বেশ সিরিয়াস দেখাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না, ছেলেটিকে জাগিয়ে তুলবে কিভাবে।

'আমি এটা বুঝতে পারছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না!' ছেলেটির বাবা এখনো হতবুদ্ধি, তবে চিন্তাশক্তি ফিরে পাচ্ছেন আবার। 'আমি এখানে এসেছি ছুটি কাটাতে, সাথে আমার ছেলেও আসে। তৃতীয় রাতে পালায় ও। কোথায় যায়, কেন যায়, কিছুই ঠাওরাতে পারিনি।'

'আরে, ও তো নিতান্তই ছেলেমানুষ,' কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'হয়তোবা বনের পাশে আগুনের আকর্ষণেই ছুটে এসেছে। খোলা জায়গাটায় একটা খড়ের গাদা পুড়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খড়ের গাদাটা পুড়তে দেখে সে। আগুনটা খুব শিগ্রী নিভে যায়।'

অনুবাদ : অনন্ত আহম্মেদ

দ্য ডিসকোভারি অব এ প্ল্যানেট

ভ্লাডিমির শোরবাকভ

আগেরদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশটা সেজন্যে বেশ পরিস্কার আজ। রাতে আকাশে হালকা মেঘ জমেছিল, কিন্তু আজ সকালে সব রোদ ঝলমল করছে। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর সের্গেই-এর মনে হল, পৃথিবীর সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ায় কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু এখানকার সবকিছুই একেবারে আলাদা। জেট কিংবা রকেটে চাপলে এক রকম ওজনহীন অনুভূতি হয়। এখানে ঘুমের মধ্যেও সেই অনুভূতি কাজ করে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সের্গেই। সূর্য আর নক্ষত্রের প্রচণ্ড তাপে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল একটা বড় মেঘ। জানালার নিচ দিয়ে ছুটে গেল একটা পঙ্খীরাজ ঘোড়া। সামনের গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। জানালার নিচে এখনো আবছা অন্ধকার, পঙ্খীরাজের ডানা জোড়ার আলোর ঝাপটায় অন্ধকারগুলো বিদীর্ণ হয়ে গেল। পঙ্খীরাজের আগমনে সের্গেই-এর মনে পৃথিবীর স্মৃতির রেশটা কেটে গেল।

গাছের গুঁড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে এল রুডরি। একটা জিন চাপাল পঙ্খীরাজের পিঠে। শিউরে উঠল যেন পঙ্খীরাজ। রুডরি চেঁচিয়ে বলল সের্গেইকে, 'ঘোড়া তৈরি। চলে আসুন।'

বেরিয়ে সামনের বারান্দায় এল সের্গেই। প্রতি বছর দুবার এ গ্রহ তার নিজের কক্ষপথে ঘোরার সময় জোড়া নক্ষত্রের প্রায় মধ্যখানে এসে পড়ে। এ সময় গ্রহের জ্বলন্ত নক্ষত্র-সূর্যটা থাকে একপাশে উল্টোদিকে থাকে অন্ধকার কালো-নক্ষত্র। এই দুই নক্ষত্রের অভিকর্ষের টানে গ্রহটার অবস্থা হয় দম দেয়া ঘড়ির

স্প্রিং-এর মতো। ঘূর্ণনগতি বেড়ে যায় অনেক। সব জিনিসের ওজন কমে যায়। এমনকি পাহাড়গুলোও হালকা হয়ে যায়। ঠিক এই সময়ে উড়তে পারে এমন সব প্রাণী ডানা ছড়িয়ে দিয়ে আকাশে ওড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে।

আজকের সকালটাও তেমনি এক সকাল, সব কিছুই ওজনহীন।

এই নশ্বর জগতে জন্ম নিয়েছে যে মানুষ তার মন খুবই রহস্যময়। এদের আছে চরম দক্ষতা, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে অজ্ঞই। বলা চলে তাদের ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে। এদের ধারণা কোনো কিছু সৃষ্টি করার মানে তাকে দ্বিগুণ করা। তাছাড়া কায়া এবং ছায়া, দুটোই এদের কাছে এক বাস্তব। এরা মনে করে বস্তু আর আয়নায় ফুটে ওঠা তার প্রতিবিম্ব দুটোই বাস্তব। কেবল জিনিসটা দ্বিগুণ হল ব্যাস। এই গ্রহবাসীরা এখনো জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো সুসংবদ্ধ সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি, যদিও তারা প্রাথমিক এবং অতি প্রয়োজনীয় প্রকৃত তথ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা করছে।

যাহোক, সেগৈই ভাবল সময়ে সবই হবে। যেমন পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কথাই ধরা যাক না। মহাকাশে ওড়ার যে স্বপ্ন আমাদের ছিল, তারই বাস্তব রূপ এটা। এই পঙ্খীরাজ ঘোড়া, পৃথিবীর প্রাথমিক পর্যায়ের রকেটগুলোর মতোই বিষ্ময়কর এগুলো। এই গ্রহবাসীরাও নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একদিন প্রযুক্তিবিদ্যায় দারুন উন্নত হয়ে উঠবে। হয়তো অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে, আপনমনে বলল সেগৈই, কিন্তু আজ থেকে দু'এক শতাব্দী আগে যদি আমাদের মহাকাশ যাত্রা শুরু হত, তাহলে তো এতদিনে 'রুডরি'র মতো প্রাণীদের খাঁচায় ভরে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হত।

ওদিকে পঙ্খীরাজ গর্বিতভঙ্গিতে মাথা উঁচিয়ে ডানাজোড়া ঘাস পর্যন্ত নামিয়ে আনল। একটু কেঁপে উঠল ডানার ডগাগুলো। রুডরি আর সেগৈই সময় বুঝে চেপে বসল তার পিঠে। পঙ্খীরাজ ছুটতে শুরু করল। উল্টোদিক থেকে আসা ঠান্ডা হাওয়া সেগৈই-দের মনে যেন নেশা ধরিয়ে দিল। রুডরি হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিল। আঙ্গুলের ডগা থেকে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে পঙ্খীরাজের পাঁজরে দুই পাশে আঘাত করল। পঙ্খীরাজের দুই ডানা দুই পাশে ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হল ওদের আকাশভ্রমণ।

রুডরির মুখের রং তামাটে। হাল্কা পোশাক দেখে মনে হচ্ছে যেন সে নিজেই বুঝি কোনো উড়ন্ত পাখি। স্যাঁতসেঁতে বাতাস বাধা দিতে চাইছে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আছড়ে পড়ছে ওদের ওপর। তবু আরো জোরে,

অনেক উঁচুতে উড়ে চলল দু'জন। এতক্ষণ নিচ থেকে যেসব শব্দ ভেসে আসছিল আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সেসব। সকালের শিশির ভেজা মাঠ, কাঁচের মতো চকচকে হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে চলল ওরা। উঁচু উঁচু গাছপালা দেখে মনে হচ্ছে, তারাও বুঝি আকাশে উড়তে চায়। ঢেউ খেলান গাছপালাগুলোকে ঠিক অর্গ্যানের নলের মতো দেখাচ্ছে। গরম বাড়লেই এসব গাছের ছাল গলে ঝরণার ধারার মতো গড়িয়ে পড়ে। তেকোনো পাতাগুলো শীতকালে আলো আর উত্তাপ টেনে নেয়। ফলে এসব গাছপালাদের পাতা সারা বছর তাজা, অটুট থাকে। তবে সেগৈই মনে মনে চাইছে পৃথিবীর গাছপালার মতো অন্তত একটা গাছ তার চোখে পড়ুক যে যেটা মে মাসে ডালপালা দোলায়, হেমন্তে তার শুকনো পাতা ঝরিয়ে দেয়, আর বসন্তে ফের স্বপ্ন দেখে নতুন পাতার। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে গাছের যেসব ধারা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল সেগৈই-এর ইচ্ছা। সে চাইত এই সম্পর্ক গ্রহ গ্রহান্তরে নক্ষত্র থেকে অন্য প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, যাতে জীবনযাত্রার সব সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য পুরস্কার হয়ে উঠতে পারে।

এদিক ওদিক তাকাল সেগৈই। যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজ আর বাদামী রং-এর খেলা। আসলে এটা সম্পূর্ণ নতুন ভিন্ন এক জগৎ। এই নতুন পৃথিবীর আকাশে প্রথম আবির্ভূত যন্ত্রটি ছিল পৃথিবী থেকে আসা রকেট। ওরা যত ওপরে উঠছে বাতাস ততই স্বচ্ছ হয়ে আসছে। একসময় পঙ্খীরাজ ওদেরকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে এল যেখানে কোনো গ্রহের পাখির পৌঁছতে পারে না কখনই।

ঝড় যে আসবে ওরা জানত। কিন্তু অকস্মাৎ ঝড়ের গতি ও প্রচণ্ডতা এতটা ভয়ানক হয়ে উঠবে তা ধারণাই করতে পারেনি। রুডরি তার সবুজ সন্ধানী চোখ দিয়ে আসন্ন এই ঝড়ের পূর্বাভাস পায়নি। শান্ত বাতাসের স্বচ্ছতা ওদের দুজনকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের চমক আকাশটাকে ফালি ফালি করে দিচ্ছে যেন।

রুডরি বলল, 'আমাদের আর ফিরে যাওয়ার সময় নেই। আকাশে অনেক মেঘ জমেছে আর নিচেও অসংখ্য জলপ্রপাত সবেগে বয়ে চলেছে।'

'আমরা তো গন্তব্যের উদ্দেশ্যেই যেতে পারি।'

'তা সম্ভব নয়। আপনি কথা বলার সময়েই আমরা নির্দিষ্ট যাত্রাপথ থেকে পুরো এক ভেইড (০.১৬ কি.মি.) সরে গেছি। এখন সময়মতো আমাদের যাত্রা বাতিলের ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'তার মানে, বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ।'

ওরা বুঝে গিয়েছিল স্পেস স্টেশনের সঙ্গে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঝড়ের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এখন ওরা। সেটা ছুটে যাচ্ছে কালো নক্ষত্রের দিকে। এই কালো নক্ষত্রটা সম্পর্কে নানান গল্প চালু আছে গ্রহটায়। তবে সেগুলো নিছক অর্থহীন গল্প নয়। এই গ্রহের গল্পের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থেকে প্রাণ পায়। সেগৈই এসব গল্পের মূল খুঁজে বের করতে পারেনি। সবটাই কল্পনার মতো রয়ে গেছে ওর কাছে।

যাত্রা বাতিল এই গ্রহের একটা চালু রেওয়াজ মাত্র। গ্রহবাসীরা মনে করে, কেউ যদি ওই মৃত, কালো নক্ষত্রের দিকে যেতে থাকে তাহলে সে হয়তো কোনো এক সময় তার দ্বৈত সত্ত্বার দেখা পাবে। আয়নায় ফুটে উঠবে তার এক অবিকল প্রতিমূর্তি। আয়নায় যার ছায়া ফুট উঠবে সে নিজেই প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হবে, নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসবে আবার গ্রহে। সেজন্যে ওদের বিজ্ঞানের মূল সূত্রই হল, বস্তুমাত্র নিজেকে দ্বিগুণ করে নেয়া। সেগৈই অবশ্য এতে খুব একটা অবাক হয়নি। এটা ঠিক যে প্রত্যেকটা বস্তুকণারই একটা দ্বৈত সত্ত্বা আছে। বস্তুপিণ্ড অবিরাম রশ্মিতরঙ্গ বিকিরণ করে চলেছে, সেটাই সৃষ্টি করেছে তার দ্বিতীয় অস্তিত্বের। ইলেকট্রন থেকে গ্রহপুঞ্জ সবকিছুকেই কেবলমাত্র ঘনীভূত বস্তুসমষ্টি মাত্র মনে করা হয়, যা অবিরত বিশেষ ধরনের অদৃশ্য এক রশ্মিতরঙ্গ বিকিরণ করে বলে। কিন্তু রশ্মিতরঙ্গ বিকিরণের আসল রূপ এখনো অনেকটাই জানার বাইরে রয়ে গেছে। তবে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে কারো মনে কোনো সংশয় নেই। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। সেই থেকে এই রশ্মিতরঙ্গের বিজ্ঞানে অনেক নতুন জটিল এবং চমকপ্রদ সংযোজন ঘটেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে এক ধরনের যাদু আয়না। বস্তুকণার দ্বৈতসত্ত্বার ব্যাপারে এ গ্রহের বিজ্ঞানীরা নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। এই গ্রহে আসার কিছুদিনের মধ্যেই এই আবিষ্কারের স্বরূপটি বুঝতে পারে সেগৈই। বস্তুকণা থেকে রশ্মিতরঙ্গ এবং রশ্মিতরঙ্গ থেকে আবার বস্তুকণায় রূপান্তরের ব্যাপারটা এখানকার রশ্মিতরঙ্গ; বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করে নিজেদের কাজে লাগাতে

সক্ষম হয়েছেন। কালো নক্ষত্রটার অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য আছে। বস্তুকণা থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিতরঙ্গকে নক্ষত্রটা নিখুঁতভাবে আবার গ্রহে ফেরত পাঠাতে পারে। অন্ধকার নক্ষত্রের এই অসাধারণ গুণের সুবাদে এখানকার বিজ্ঞানীরা বস্তুকণা ও রশ্মিতরঙ্গের এই পারস্পরিক রূপান্তর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কল্পিত অদৃশ্য তরঙ্গকে যতই বাস্তব বলে জাহির করা হোক না কেন, তা অনুভব করা প্রায় অসম্ভবই। এই অসম্ভব কাজটিকেই এখানে কিভাবে সম্ভব করে তোলা হল তার উত্তর এখনো খুঁজে পায়নি সেগেই।

এরই মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানি তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ চমকানর সঙ্গে সঙ্গে বারবার ওদের গতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। পঙ্খীরাজ ভীত ডাক ছাড়ছে, ওটার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ছে বারবার। রুডরির চোখমুখ কঠিন ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছে। এই ঝড়ের কেন্দ্রে এসে পড়ায় অন্যান্য বস্তুর মতো ওদেরও ওজন কমে যাচ্ছে।

কালো আকাশের দিকে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ঝড়টা। সেগেইদের মাথার ওপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সীমাহীন মহাশূন্য। ওখনেই কোথাও লুকিয়ে আছে উজ্জ্বল সূর্যের প্রতিচ্ছবি কালো সেই নক্ষত্রটি। যতদূর চোখ যায় কেবল কালো মেঘের সারি।

রুডরি চেঁচিয়ে বলল, 'আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। ঠিক সময়ে আমাদের যাত্রা বন্ধ করার কথাটা মনে রাখবেন। এটা সঙ্গে রাখুন—'

'কি ওটা?'

'প্রশ্ন করবেন না। বললে কিছুই বুঝতে পারবেন না এখন। সময়মতো ওটার ভেতর তাকালেই চলবে। ওটার ভেতর আপনার চেহারা দেখা দিলেই আপনার সমস্ত মনযোগ সঞ্চালিত করবেন। প্লেটের ওপর ফুটে ওঠা ছবিগুলো হল হলোগ্রাম। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনার নিজের হলোগ্রাম দেখাতে যেন ভুল না হয়।'

এইমাত্র রুডরি সেগেই-কে যে প্লেটটা দিল সেটার দিকে তাকিয়েও দেখল জিনিসটা কাঁচ বা স্ফটিকের মতো পুরোপুরি স্বচ্ছ। ওটার ভেতর দিয়ে অবাধে দৃষ্টি চলে যায়। প্লেটটার ওপরে কোণের দিকে একটা ছোট বিন্দু এবার সেগেই-এর নজরে পড়ল। প্লেটটা কিঞ্চিত ঘোরাতেই বিন্দুটা প্লেটের ঠিক মাঝখানে চলে এল, তারপর বড় হতে লাগল ক্রমশ। প্লেটটার গায়ে দুজন আরোহীসহ একটা পঙ্খীরাজের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আরোহীরা আর কেউ নয়, ওরা দুজন। নিজের চেহারাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কালো নক্ষত্র

থেকে বিচ্ছুরিত অবিরত রশ্মিতরঙ্গ এই ক্রিস্টালের প্লেটে একটা ছবিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু কেবল রশ্মিতরঙ্গ বিকিরণ আর তার প্রতিফলনের কারণেই এটা ঘটছে তা নয়। বিদ্যুৎবাহী চৌম্বক বা আলোকতরঙ্গ শুধু প্রতিফলন সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কেন বস্তু বা বস্তুসমষ্টি থেকে রশ্মিতরঙ্গ বের হয়ে যখন একসঙ্গে মিশে যায়, তখন প্রতিফলনের চাইতে আরো বেশি কিছু সৃষ্টি হয়। এই ক্রিস্টাল প্লেটের উল্টোদিকে কোথাও নিশ্চয়ই ওদের দ্বৈত সত্ত্বা আছে। যা এই প্লেটটার মাধ্যমেই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে।

মনের ও চোখের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড চাপ পড়ায় সেগৈইদের সামনে যেন রংধনুর সাত রং নাচতে লাগল। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু। নিজে.দর পুরো চেতনাকে ক্রিস্টাল-প্লেটে সঞ্চালিত করে, একাগ্রচিত্তে উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা প্রতিচ্ছবির মধ্যে মিশে গিয়ে বদলে গেল ওরা। এক মুহূর্তের জন্য ওদের মনে হল, যেন মহাশূন্যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ওরা। তারপরই এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে উঠল ওদের মন। আগেই ওদের চলার পথ বেঁকে গিয়েছিল। কালো নক্ষত্রের থেকে সরে আসছিল ওরা। ওদের মনে হল নিজেদের প্রতিচ্ছবির মধ্যে বদলে গিয়ে আবার গ্রহেই ফিরে যাচ্ছে ওরা। দিক বদলের ফলেই সুখকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল ওদের মনে।

খানিক আগেও মনে হচ্ছিল চারিদিক অন্ধকার গ্রহের অর্ধেকটা যেন কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে কেউ, আর বাকী অংশ মিটমিট করে জ্বলছে যেন মোমবাতি। কিন্তু হঠাৎ সবকিছু পালটে গেল। আবার ঝকঝকে আকাশ দেখা দিল, হালকা হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে সেখানে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ঘাসগুলো ভিজে আছে। সেই তাণ্ডব ঝড়ের চিহ্নই নেই কোথাও, তার জায়গায় উজ্জ্বল ঝকঝকে আবহাওয়া।

দুটো সূর্য এই গ্রহের। একটি উজ্জ্বল ঝলমলে, অন্যটি অন্ধকারময়। এই দুই সূর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে জোড়া নক্ষত্রের জগৎ। এই গ্রহটি উজ্জ্বল সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কালো অন্ধকার নক্ষত্রের দিকে কেউ গেলে তার ফিরে আসার উপায় একটা, কালো নক্ষত্র থেকে বিচ্ছুরিত প্রতিচ্ছবির সাথে মিশে যেতে হবে তাকে। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থায় কোনো জটিলতা নেই। কালো নক্ষত্র যে নিখুঁত অবিকৃত বেতারসংকেত ফেরৎ পাঠায় সকলেই জানে তা। কিন্তু বেতার তরঙ্গই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ ফিরে

আসতে পারে কিনা তা নিয়ে কেউ কখনো আলোচনা করে না। অবশ্য পৃথিবীর কাউকে না কাউকে পরীক্ষাটা একদিন না একদিন করতেই হত। সেগৈই-এর ধারণা রুডরি আর সে তেমনি একটা পরিস্থিতিতে পড়ায় একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। প্রথম পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা চালাতে পারত ওরা। তাহলে ঝড়টা হয়তো ওদেরকে গ্রহের একেবারে কোপারনিকাস পাহাড়ের গুহায় কি আরো দূরে কোথাও টেনে নিয়ে যেত। কল্পনাকে আর বেশিদূর এগুতে দিল না সেগৈই।

নিরাপদে ফিরে আসতে পারল কী কারণে বোঝার চেষ্টা করছে সেগৈই। রুডরির নাচ দেখার সময় চিন্তাটা আচ্ছন্ন করে রাখল ওকে। গ্রহে প্রত্যাবর্তনের পর এই নৃত্যটা এখানে অবশ্য পালনীয় এক অনুষ্ঠান। রুডরির কোণাকুণি নিখুঁত স্টেপিং-এ সেগৈই যেন ওদের-ফিরে আসার আগ মুহূর্তের আতঙ্কে, ভীত পঙ্খীরাজের বেসামাল অবস্থা সব দেখতে পাচ্ছিল। স্রেফ দক্ষতা দিয়ে জ্ঞানের ঘাটতি কতটা কমান সম্ভব তাই ভাবছিল সেগৈই। প্রকৃতির অজানা এক প্রক্রিয়ায় সুদূরের এই গ্রহের অধিবাসীদের যেন যাদুকর হিসেবে সৃষ্টি করেছে। এরা প্রকৃতি এবং এর সকল জীবন্ত শক্তিকে অনুভব করার ক্ষমতা পেয়েছে। জীবনস্রোত ঠিক যেন কোনো চৌম্বকক্ষেত্রের মতো রশ্মিতরঙ্গ পাঠিয়ে চলেছে। এখানকার অধিবাসীরা নানান প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সম্পর্কে আবিষ্কার করে সেগুলোকে প্রতীকের রূপ দিয়েছে। শব্দ বা নৃত্য কিংবা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করছে তাকে। গভীরভাবে চেতনাকে স্পর্শ করে না এমন কিছু নেই এদের কাছে। বিশ্বের সকল প্রাণ ও জড় পদার্থের মূল অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে হবে শিল্পকে। এইভাবে ফিরে আসার ব্যাপারটা এই শিল্পকর্মেরই উন্নততর বিকাশ। হয়তো আকস্মিকভাবেই শুরু হয়েছিল এটার, সেই থেকে আবেগের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট নিয়মে পুরুষানুক্রমে মেনে চলা হচ্ছে। এখানে সঙ্গীতেই দর্শনের জায়গা দখল করে নিয়েছে—মনের চিন্তা সুর ও ছন্দের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। তবে এরাও আজ নতুন জ্ঞানভাণ্ডারের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এদের অল্প কিছু পুঁথিপত্র পড়ার সুযোগ হয়েছে। চিন্তাকে এরা আসলে আত্মার সাথে নিঃশব্দ কথোপকথন হিসেবে আখ্যায়িত করে। ভাবল, এমন একটা দিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন এরা বুঝতে পারবে যে রশ্মিতরঙ্গ আসলে বস্তুজগতেরই স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু না, তখন হয়তো এরা পঙ্খীরাজের

পিঠে উড়ে বেড়ানটা ভুলে যাবে। পঙ্খীরাজই হয়তো তখন পরিণত হবে অতীত স্মৃতিতে কিংবা প্রাচীনকালের কোনো নিদর্শন হয়ে টিকে থাকবে।

ক্রিস্টালের প্লেটটা আবার বের করল সেগেই। কালো নক্ষত্রের দিকে খাড়া করে ধরল ওটা। নক্ষত্রের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে ও। সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল প্লেটটা। সেগেই-এর চেহারা ভেসে উঠল তাতে। কালো নক্ষত্র থেকে বিকিরিত রশ্মিতরঙ্গের সঙ্গে প্লেটের প্রতিফলন মিশে গেল। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল সেগেই। ওই স্ফটিকের ক্রিস্টালের উল্টোপাশে কোথাও আছে ওর দ্বৈত সত্ত্বা।

অনেক সময়ে সেগেই-এর মনে হয় এখানকার আকাশ নীল এবং হলুদ মোজাইকে তৈরি। ওই অসীম নীল আকাশে যেন হলুদ রং-এর ফুল এঁকে দেয়া হয়েছে। ওই সীমাহীন বিস্তারে ভাসমান প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অজানা কোনো রহস্যের চাবিকাঠি।

সুদূর নীহারিকাপুঞ্জের মেলায় লুকিয়ে থাকা অজানা এ গ্রহটার স্পেস স্টেশনে সাপ্তাহিক ছুটির দুপুরে বিশ্রাম করছিল ওরা। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আরে দেখ, দেখ, একটা প্রজাপতি।'

মুখ তুলে তাকাল সবাই। প্রকাণ্ড একজোড়া নরম সবুজ পাখা মেলে মাটিতে ছায়া ফেলে একবার ওপরে উঠছে, আবার নামছে পতঙ্গটা। ওটা কি বাতাসের ধাক্কায় পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে, নাকি দীর্ঘদিন মহাকাশে টিকে থাকার জন্য সৃষ্ট কোনো প্রাণী? প্রজাপতিটার বিশাল পাখা দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল যে ওগুলোর সাহায্যে সৌরশক্তি আহরণ করে সূর্যরশ্মির পথ ধরে বিচিত্র মহাকাশযানের মতো ঘুরে বেড়ানটা ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সেগেই এগিয়ে যেতেই পতঙ্গটা বিশাল দুই পাখা মেলে উপরে উঠে গেল। সেগেই ভাবল, একটা গ্রহে জীবনের কত বৈচিত্র্য, কত রহস্য। একটা গ্রহের সব কিছু জানতে না জানি কত বিনিদ্র রজনী কেটে যায়। আমরা সাতদিন ধরে কাজ করছি, কিন্তু কতটুকুই বা জানি এই গ্রন্থ সম্পর্কে? কিছুই না।

এদিকে আরো অদ্ভুত একটি জিনিস আবিষ্কার করেছে ওরা। স্পেস স্টেশনের পাশের বালিয়াড়িতে একদিন একগুচ্ছ মিলফয়েল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই দেখা গেল, বালিয়াড়ির ওপর মিলফয়েলের ঝোপ ঘন হয়ে বেড়েই চলেছে। অতি চেনা তীব্র গন্ধঅলা বেগুনি ফুল ফুটেছে

ওগুলোয় আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, ঝোপের একটা পরিবার গড়ে উঠেছে। এটা কি আকস্মিক ঘটনা, নাকি প্রাণ অনবরত সৃষ্টি হয় তারই অকাট্য প্রমাণ?

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সেগৈই। হঠাৎ রুডরির কথা কানে এল। 'ওটা তো কারমনিস জাতের প্রজাপতি।' একটা মখমলের মতো সবুজ প্রজাপতি ছটফট করছে তার হাতে। সেগৈই-এর দিকে বাড়িয়ে দিল।

'এটা কে ধরতে বলেছে তোমাকে?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সেগৈই। প্রজাপতিটা দেখছে না।

'মহাকাশ প্রজাপতি এটা। আপনিই তো এখানকার পোকামাকড়, প্রজাপতি, সব রকমের ঘাস এবং গাছের নমুনা জোগাড় করতে বলেছিলেন।'

'তা বলেছিলাম। ঠিক আছে এখন ছেড়ে দাও ওটাকে। পরে দেখা যাবে।'

প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দিল রুডরি। উড়ে গেল সেটা এক দৃষ্টিতে ওটার ছন্দময় পাখা ওঠানামা দেখতে লাগল সে।

'চল, ফেরা যাক,' সেগৈই বলল।

সামনের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠল ওরা। তারপর ওখান থেকে নেমে একটা ছোট নদী পেরিয়ে এগিয়ে গেল আরো অনেকটা। দিনের আলো মুছে গিয়ে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে ইতোমধ্যে। নরম স্নিগ্ধ আলোয় হেঁটে গেল ওরা। পৃথিবীতেও এইভাবে সন্ধ্যা নামে।

হঠাৎ সেগৈই দূরে একটা গাছ দেখতে পেল। ঘন কালো ওটার চূড়া। সুন্দর ডালপালা দেখে কেমন যেন খুব চেনা বলে মনে হল ওটাকে। ধীরে ধীরে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল সে। মনে হল গাছটা যেন তার ঘন পাতায় ছাওয়া ডালপালা নেড়ে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। গাছটার মসৃণ চওড়া গুঁড়ির সামনে বসে সেখানে মুখ ছোঁয়াল সেগৈই। রোয়ান গাছটার পাতাগুলো ওর গায়ে যেন মৃদু পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল, আদর করছে যেন।

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

হিজ উইপন

ভায়াচেশ্লাভ ভিরুবাকভ

এই তাহলে জঙ্গল! সূর্যের সোনালি রশ্মি খেলা করছে সবুজ বনানীর মাঝে, ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা কুয়াশা, ফাঁকা মাঠে বেগুনি রঙের ঝোপের বাহার, কেমন মধুর মতো মিহি একটা গন্ধ ভেসে আসছে কোথাও থেকে, বিশাল আকারের ফার গাছ মাথা উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঘন ছায়ার মাঝে ছোট একটি নদী বয়ে চলেছে কুলকুল শব্দে।

সল্ট নদীতে পা ফেলে হাঁটছে, তিরতিরে ঢেউ উঠছে তার প্রতিটি পা ফেলার তালে। সল্ট সিদ্ধান্ত নিল এবার একা বিশ্রাম নেবে। সাড়ে পাঁচ ঘন্টা হেঁটেছে সে, এখন দুপুর। বাড়ছে তাপমাত্রা। গরম লাগছে। পিঠ থেকে রুকস্যাকের বাঁধন খুলে ফেলল সল্ট, ছুঁড়ে দিল নরম শ্যাওলার ওপর। তারপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ব্রীজের পাশে। এক মিনিট শুয়ে থাকল ও, তারপর ব্যাগ খুলে কিছু খাবার খেল। ভাবছে ওদের সঙ্গে কোথায় মিলিত হবে। ডিরেক্টর যদিও বলেছেন ব্যাপারটা অপরিহার্য নয়। তবে ডিরেক্টর নিশ্চিতভাবে জানেন না কিছুই। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিরকম হবে? ভেবে লাভ নেই কোনো। কিন্তু না ভেবেও পারছে না সল্ট। অন্য শহর, অন্য নাগরিক—সল্ট শুধু জানে ওদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং ওরা ভীষণ রকম আলাদা। কিন্তু ওরা দেখতে কেমন? অনিচ্ছাকৃত হাসি ফুটল সল্টের মুখে, ওর নার্ভাসনেসটা চলে গেল, এ ধরনের জঙ্গলে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করা মুশকিল। আর নার্ভাস হবার কি আছে? প্রতিযোগীর প্রতি প্রথম এবং একমাত্র নির্দেশ হল, নিজে যা ভালো মনে করবে করো। কনসিল্ড ওয়ানরা কি করে তার আচরণ

বিশ্লেষণ করবে? একটা মস্ত বড় পাখি ছাদ আর ভারী শেডের মাঝখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদিকে দৃষ্টি চলে গেল সল্টের। পাখিটা একটা ডালে বসল। মাথা তুলল সল্ট। পাতার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো সূর্যের আলো ছুঁয়ে গেল ওকে। এক চোখে সল্টের দিকে তাকাল পাখিটা। বেশ বড় পাখিটা... সে নয়তো? পাখিটার দিকে চোখ রেখে হাসল সল্ট, তারপর রুকস্যাকটা আবার ঝুলিয়ে নিল পিঠে। যাত্রা শুরু করল।

তাকে যা বিদায় সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল। নগরীর ডিরেক্টর ওকে আলিঙ্গন করেছেন এবং রুকস্যাকে সব জিনিস ঠিকঠাক বাধা ছাঁদা হয়েছে কিনা তা নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন। বাবা তিনবার তাকে চুমু খেয়েছে সবার সামনে। আর বোন, কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল করে সেও সবার সামনে চুমু খেয়েছে।

তারপর সল্ট ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে গোলাকার প্লাটফর্মে উঠে গেছে। এরপর নিজেকে আবিষ্কার করেছে এই জঙ্গলে।

সল্ট তার শহরকে ভালোবাসে। আর বিজয়ের ব্যাপারেও তার নিশ্চিত বিশ্বাস। অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করা খুব বেশি দরকার ছিল না। ডিরেক্টর বলেছেন কলসিল্ড ওয়ানরা যদি কোনো প্রতিযোগীর ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হতে পারেন তাহলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। ডিরেক্টর বলেছেন কোনো কিছুই আসলে কংক্রিট নয়। যা তোমার করতে ইচ্ছা করবে না, করার দরকার নেই। আর কোন বোকাই বা যা করতে ইচ্ছে করে না তা করতে যায়? সল্ট মনে মনে ভাবল, আমি নিশ্চয়ই আগ বাড়িয়ে মারামারি শুরু করতে যাব না। তবে প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াব। এই ভাবনা ওর মনে সন্তুষ্টি এনে দিল। শক্তির একটা স্রোত যেন উথলে উঠল শরীরে। লাফ মারল সল্ট। এক লাফে পাইন গাছের মোটা একটা ডালে উঠে পড়ল।

সল্ট জানে সে জিতবে।

ব্যাপারটা দুঃখজনকই বলতে হবে, অন্যজন যদি হেরে যায় সল্টের কাছে, অদৃশ্য হয়ে যাবে তার নগরী। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে ভয়ঙ্কর ইনার ওয়ার্ল্ডে, যে পৃথিবী সম্পর্কে কারোরই স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।

কোনো কিছুই ঘটা অসম্ভব নয়। আর ব্যাপারটা ঘটবেই। নগরীগুলোর জনসংখ্যা বেড়ে চলছে, নগরীর বিস্তৃতি বৃদ্ধি প্রয়োজন, এর মানে বেশ কিছু নগরীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। ঠিক কতগুলো নগরী আছে সল্ট নিজেও জানে না। তারা একেক সময়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ডিরেক্টর

সংকেত পেয়ে নগরীকে প্রস্তুত করেছেন একজন চ্যাম্পিয়নকে পছন্দ করতে। সল্ট অবশ্য ভাবেনি তাকেই নির্বাচিত করা হবে। প্লাটফর্মে চড়ে বসার সময়ও কোনো ধারণা ছিল না। কোথায় যাচ্ছে সে। তবে জঙ্গলে এসে ভালোই লাগছে ওর। হাঁটছে সল্ট, সন্দেহ নেই কনসিল্ড ওয়ানরা ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছেন। এভাবে তারা নগরীর ক্ষমতা ও শক্তি যাচাই করেন। বিজয়ী শহরগুলো আকারে বৃদ্ধি পায়, বিজেতা শহর পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে কোনো নাগরিকই খেলার আইন কানুন সম্পর্কে কিছু জানে না। কনসিল্ড ওয়ানরা কিসের ওপর ভিত্তি করে বিজয়ী নির্বাচন করেন সে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

কনসিল্ড ওয়ানরা কারা? তাদেরকে কেউ কখনো দেখেনি, তাদের কণ্ঠস্বরও কেউ শোনেনি। আর রহস্য ভেদ করার চেষ্টাও কেউ করেনি, শুধু শিশুরা নিজেদের কনসিল্ড ওয়ান ভেবে খেলা করে। এ রহস্য গ্রীষ্ম এবং শীতের মতোই অমোঘ বলে মেনে নিয়েছে সবাই। প্রাপ্তবয়স্করা এ নিয়ে কখনো কিছু ভাবে না।

আমিই বা ভেবে কি করব, ভাবে সল্ট। নিশব্দে পাইন পাতার ঘন কার্পেট মাড়িয়ে হেঁটে চলেছে ও। মধু গন্ধা বাতাস, মাথার ওপর নীল রঙের পিলার ভেসে আছে। হাঁটতে হাঁটতে সল্ট চিন্তা করে অপরজন এখন কি করছে।

শেষ হয়ে আসছে দিন, সল্ট জঙ্গলের মধ্যে প্রশস্ত, ফাঁকা একটা জায়গায় এসে পড়ল। এখানে প্রচুর ফুল ফুটে আছে। জায়গাটার মাঝখানে ধূসর রঙের ছোট একটি কুটির, সবুজ আর নীলাভ ধূসর শ্যাওলায় ঢাকা, একদিক হেলে আছে, যেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। রূপকথার বাবা ইয়াগার কুটিরের মতো প্রাচীন, বিদায়ী সূর্যের সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। শুধু এ কুটিরের নিচে গল্পের ইয়াগার মতো ঠ্যাং নেই। দাঁড়িয়ে পড়ল সল্ট।

'কুটির, ছোট্ট কুটির, ঘোরো আমার দিকে,' ছেলেবেলায় পড়া গল্পের মতো সুর করে বলল ও শ্বাস চেপে। কুটিরটা অবশ্য ওর দিকে প্রায় মুখ ফিরিয়েই আছে। 'বাড়িতে কেউ আছেন?' ভীরু গলায় ডাকল সল্ট।

কোনো সাড়া মিলল না।

পা বাড়াল সল্ট ছোট্ট বারান্দার দিকে, পা রাখল সিঁড়িতে। থেমে দাঁড়াল। পিঠ থেকে রুকস্যাক খুলল, বাম হাতে ঝুলিয়ে নিল স্ট্র্যাপ ধরে। তারপর ধীরে সুস্থে ঢুকল ভেতরে।

কুটিরে শুধু ছোট একটা ঘর, ছোট ছোট জানালা, দু পাশের দুই দেয়ালে। কাঁচা হাতে বানান একখানা টেবিল আর দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে সল্ট। আমি ভাগ্যবান। মনে মনে বলল ও। দেখেই বোঝা যায় শরতের পরে এ ঘরে কেউ ঢোকেনি। বাদামী, কুঁকড়ে যাওয়া পাতা ছিটিয়ে রয়েছে মেঝেতে। টেবিলে রুকস্যাক রাখল সল্ট, হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। পায়ের নিচে মড়মড় করে উঠল কাঠের মেঝে। মেঝে ঝাঁট দেয়া দরকার, ভাবল ও। পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে মুড়মুড়ে পাতাগুলো ঘরের এক কোণে স্তূপ করল। তারপরই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঘরটার ছাড়াছাড়া ভাবটাই গেছে নষ্ট হয়ে। বারান্দায় গেল ও। পাশে জঙ্গল আশ্চর্য স্থির।

'এখানে সঠিকভাবে কাজ করব কিভাবে, বলে দিন প্লীজ,' জোরে বলল সল্ট।

ও ভেবেছিল সবকিছু অন্যরকম ঘটবে, একের পর এক বাধা আসবে, ড্রাগন ঝাঁপিয়ে পড়বে, পাহাড় ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটেনি। মনে হচ্ছে যেন ছুটি কাটাতে এসেছে ও। ঠিক আছে। তবে এরকমই চলতে থাকুক। গভীর শ্বাস টানল সল্ট। গাছের আড়ালে ডুবে গেছে সূর্য, আঁধার ঝপ করে নেমে এল কুটিরের ওপর। কাল আবহাওয়া ভালোই যাবে, আশা করল সল্ট। সে ঘরে ঢুকল খুশি মন নিয়ে। খুলল রুকস্যাক। বেশ কয়েকটা ফুড ট্যাবলেট মুখে পুরে নিল। তারপর ফ্লাস্ক খুলে পান করল পানি। বেশ! এখন সিন্দুকের ওপর শুয়ে জম্পেশ একটা ঘুম দেয়া যায়। মন্দ হবে না ব্যাপারটা। কিছু ঘাসের চাপড়া এনে মাথার নিচে রেখে বালিশের কাজ চালিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু জ্যান্ত ঘাস কেটে কাজটা করতে মন চাইল না সল্টের। সিন্দুকে কি আছে ভাবছে ও।

সিন্দুক খুলল সল্ট। ভেতরে বেশ কয়েকটা বাক্স, একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা। নানা আকারের। ইস্পাত আর ম্যাট প্লাস্টিকের তৈরি। সবচে' ওপরেরটা বড়, সমতল বাক্স। খুলল সল্ট। ভেতরে অনেকগুলো ফুড ট্যাবলেট আর টিউব। বোঝাই যায় বিভিন্ন কারখানার তৈরি মাল। আর বিভিন্ন সময়ের।

'ধন্যবাদ বন্ধুরা,' জোরে জোরে বলল সল্ট। 'তবে আমার কাছে নিজের জিনিস আছে।'

হঠাৎ ওর মনে হল এখানে ও-ই প্রথম আসেনি, খেলোয়াড়রা একের পর এক এসেছে এ রাস্তায়। উপলব্ধিটা ওকে যেন ক্ষণিকের জন্যে স্তম্ভিত করে দিল। তার মানে হুট করে এখানে ও চলে আসেনি। আর এই কুটির এবং

জিনিসপত্র সম্পর্কে সে যা ভেবেছে তা সত্যি নাও হতে পারে। ওর পা জোড়া ওকে সেখানে নিয়ে গেছে, হেঁটেছে সল্ট। কমপক্ষে চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়েছে সে, এসেছে এমন এক জায়গায় যেখানে আসলে ওর আসার কথা ছিল। ভাবনাটা ওর শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতির সৃষ্টি করল।

ওর আগেও এখানে কেউ এসেছে। রেখে গেছে খাবারগুলো। হয়তো এগুলো বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনি, অথবা পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের কথা ভেবেছে সে। শোনা যায়, এমন নগরী আছে যেখানকার অধিবাসীরা অভুক্ত থাকে। হতে পারে ওদের চ্যাম্পিয়নদের ভ্রমণের জন্যে পর্যাপ্ত খাবার নেই। আমাদের খাবারটাই সেরা, নিজের টিউব থেকে ডজনখানেক ট্যাবলেট বের করতে করতে ভাবে সল্ট। একটা খালি কুঠুরীতে রেখে পেন্সিল দিয়ে লিখল, এগুলো খেয়ে নিও, ভাই। এগুলোই সেরা। তারিখ লিখতে গিয়েও লিখল না। অন্য নগরীর দিন-তারিখ অন্যরকম হতে পারে। আর ওর লেখা? সল্ট জানে না ওরা তার হাতের লেখা পড়তে পারবে কিনা।

নিজেকে রিল্যাক্স লাগছে সল্টের। নিজের দায়িত্ব পালন করেছে সে। এবার খানিকক্ষণ ধ্যান করা যায়। আমরা জানি কিভাবে বাতাস থেকে খাবার তৈরি করা যায়, জানি নগরীর গভীর পাতাল থেকে ম্যাগমা ব্যবহার করে কিভাবে ফ্যাব্রিক আর দালান কোঠা তৈরির সরঞ্জাম বানান যায়, তবে এখনো জানিনা দুর্ভেদ্য ফোর্স ফিল্ডের বাইরে কারা থাকে। কাজেই কিভাবে দাবি করি 'এগুলোই সেরা?' সন্দেহের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সল্ট, একটা ট্যাবলেট গিলে ফেলল অনিশ্চয়তা নিয়ে। না, শেষে সিদ্ধান্তে এল সে; স্বাদটা সত্যি ভালো।

আঁধার ঘনিয়েছে। জানালা দিয়ে গ্রীষ্মের রাতের ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। ঘুমন্ত গাছগুলোকে ঘিরে আছে কুয়াশা। প্রশস্ত ডানা মেলে উড়ে এল বড় একটা পাখি, বসল কুটিরের মাথায়, পালকে শিস তুলল নির্জন রাতের নিস্তব্ধতায়। মুচকি হেসে সল্ট ভাবল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো আমার চারপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ পাখিটাকেই না সে দিনের বেলা দেখেছে? তবে ওর ধারণা সঠিক প্রমাণ করার উপায় কি? একটা গল্প মনে পড়ে গেল ওর। মাছের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল এক পাখি। ঝগড়া করতে গিয়ে দু'জনের পরিচয়। মাছ ঠাট্টা করছিল পাখিকে শুধু আকাশে উড়ে বেড়ানর জন্যে আর পাখি বিদ্রুপ করছিল মাছকে পানিতে সাঁতার কাটার জন্যে। ঝগড়ার মাঝখানে পাখি ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে। মাছ তাকে সাঁতার শেখানর চেষ্টা

করে। কিন্তু পাখি ডুবে যেতে থাকে। মাছ তখন পাখিকে উদ্ধার করে তীরে পৌঁছে দেয়, উপদেশ দেয় আকাশে ওড়ার চেয়ে ভালো কিছু করতে, না পারলে তার সে কাজই শধু করা উচিত। এমন সময় ঢেউ এসে তীরে ঠেলে দেয় মাছকে। এতে পাখি খুব খুশি হয়। মাছকে ওড়ার জন্যে তাড়া দিতে থাকে। তবে শিগ্রী বুঝতে পারে মাছ আর তার লেজ নাড়তে পারছে না উড়তে শেখার জন্যে। পাখি মাছকে সাগরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। বিড় বিড় করে বলে, 'সাঁতার শিখে আসলে কোনো লাভ নেই।' তারপর থেকে তারা দু'জনে দু'জায়গায় আছে। একজন পানিতে, অপরজন আকাশে।

পরের বাক্সে একটা ব্লাস্টার।

শিস দিয়ে উঠল সল্ট, জিনিসটা চিনতে পেরেছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালোবাসে ও, প্রায়ই যায় টেকনোলজি মিউজিয়ামে, ওখানে নানা রকম অস্ত্র আছে। শোনা যায়, বিশেষ কিছু নগরীতে অস্ত্রগুলো নাকি এখনো ব্যবহার করা হয়। তবে সল্টের বিশ্বাস হয়নি একথা। সল্টের কাছে ব্লাস্টার, অন্য মেসিনের মতোই, ধরা যাক ট্রাক্টর, সেকেলে এবং জবরজঙ্গ একটা জিনিস। নরম নীল রঙের একটা জিনিসে শোয়ান ব্লাস্টারটা সাবধানে তুলে নিল সল্ট। ভালোই মনে হল ওটাকে, ওজনেও হালকা। তবে বেশ অবাক হয়েছে সল্ট। অবাক হয়েছে জেনে সে এক সময় প্রতিযোগিতায় অস্ত্র ব্যবহার করা হত। ডিরেক্টর বলেছিলেন কোনো অস্ত্র এমনকি ছুরি নেয়াও সাংঘাতিক রকম নিষেধ। ঐতিহাসিক ছবির গানফাইটারদের মতো ব্লাস্টারটা পাতার স্তূপের দিকে তাক করে ধরল সল্ট। তারপর, যেন মাথার ওপরে কেউ হামলা করতে আসছে, এমন ভাব করে ওটা শূন্যে উঁচিয়ে ধরল সে। এই নিখুঁত অস্ত্রটা বেশ শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে। হয়তো অনেকদিন ধরেই এটা এখানে আছে। মানুষ কি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে একসময় পরস্পরের প্রতি বন্দুকবাজি করত? লুকান জায়গা থেকে কাউকে মেরে ফেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

ভাবনাটা মাথায় আসতে বিতৃষ্ণায় নাক কোঁচকাল সল্ট। অস্ত্রটার চার্জ করা আছে কিনা কে জানে। ইণ্ডিকেটরটি দেখে মনে হচ্ছে হয় তাপ দিয়ে ফায়ার করা হয়েছে কিংবা চার্জ আস্তে ধীরে ক্ষয় হয়ে গেছে। পাতার দিকে আবার ব্লাস্টার তাক করে ধরল সল্ট, ট্রিগার টেপার জন্য নিশপিশ করছে আঙুল, যেন নিজে থেকেই বিস্ফোরিত হবে ব্লাস্টার; আঙুল ট্রিগার টেনে ধরল, যেন নিজে নিজেই।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের কোণার ছায়া আলোকিত হয়ে উঠল।

সল্ট আস্তে আস্তে নামাল ব্লাস্টার।

পোড়া কাঠের মেঝে থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে।

হাঁটুজোড়া ভীষণ দুর্বল লাগল সল্টের, ধপ করে বসে পড়ল। হাঁটুতে বাড়ি খেল ব্লাস্টারের। ব্যাথা পেল। অস্ত্রটা তখনো ধরে আছে ও। ভয়ঙ্কর ডেথ মেসিনটা তখনো ছাড়েনি সল্ট।

ঘেন্নায় ব্লাস্টারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সল্ট। তাকাল হাতের দিকে, ভেজা আঙুলগুলো কাঁপছে। ট্রাউজারে আঙুল মুছল ও। কিন্তু যতই মোছামুছি করুক কাঁপুনি সহজে থামবে বলে মনে হয় না। এমন সময় মনে পড়ল ওকে কেউ লক্ষ্য করছে।

ভাবনাটা মুড নষ্ট করে দিল সল্টের। শ্বাস নিল ও, এক লাফে উঠে দাঁড়াল। সাবধানে, বিতৃষ্ণার সাথে ব্লাস্টারটা আগের জায়গায় রেখে দিল। বন্ধ করল বাক্স। যেটা যেমন ছিল সব ঠিকঠাক মতো রেখে সিন্দুক বন্ধ করে দিল সল্ট। এর ভেতরে আর কি আছে জানার ইচ্ছে চলে গেছে।

উদাস ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সল্ট।

ঘুমাচ্ছে বনভূমি, ফুলগুলোর মুখ বোজা, গাছের মগডাল থেকে কুয়াশা যেন নামছে হামাগুড়ি দিয়ে, ভেসে রইল ঘাসের ওপর স্বচ্ছ, পেলব প্রলেপ হয়ে। জঙ্গলের নৈশব্দ এখন স্থির এবং স্যাঁতসেঁতে। এত পরিস্কার যেন কান পাতলে শোনা যাবে, অনেকটা গ্রীষ্মের আকাশের তিন তারার মতো—ভেগা, ডেনেব ও আলাটায়ার—নীলের মাঝে শব্দহীন বাজছে। সুগন্ধী বাতাসে শ্বাস টানল সল্ট। ভাইল মেসিন, মনে মনে ভাবল ও। খুব কাছে এবং উষ্ণ। এরকম অশান্তি লাগছে কেন ওর?

সিন্দুক থেকে অনেকটা দূরে, মেঝের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল সল্ট। ঘুমাবে।

পাখিদের কিচির মিচির শব্দে পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল সল্টের। মনের ভেতর কু ডাক ডাকছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ও। উঠে বসল সল্ট, আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীরের সমস্ত পেশী।

'দাঁড়াও,' বলল ও, নিজের কণ্ঠ দুঃস্বপ্নটাকে দূর করে দেবে, আশা করল। কিন্তু নিজের কণ্ঠ চিনতে পারল না সে।

দূর হলো না দুঃস্বপ্ন।

সল্ট যদি ঘুরতে ঘুরতে এই কুটিরে এসে হাজির না হত, ব্লাস্টারটিও চোখে পড়ত না ওর। এর মানে কি এমন হতে পারে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সে যেই

হোক না কেন, একই রকম কুটিরে এসে পৌঁছেছে এবং একই রকম ব্লাস্টার দেখতে পেয়েছে?

আর সে যদি কোনো শহর থেকে এসে থাকে তাহলে কোন অস্ত্রটা কমন?

দ্বিধাদ্বন্ধে ভোগার কি আছে? তার খোলামেলা হওয়া উচিত।

'সে যদি অস্ত্রটা নিয়ে থাকে তাহলে কি আমাকে খুন করবে?' জোরে জোরে জানতে চাইল সল্ট।

'দাঁড়াও,' নিজেকেই নিজে শোনাল ও। 'দাঁড়াও, ওটা নিশ্চয়ই বিজয় এনে দেবে না?'

কিন্তু কি বিজয় এনে দেবে তা কি জানা সম্ভব?

যতসব আজগুবী চিন্তা। এরকম চিন্তা আমার মাথায় আসে কি করে? হুট করে কাউকে খুন করে ফেলা কি সম্ভব? কিসের জন্যে? এজন্যে কি যে তাহলে আমার শহর বিলীন হয়ে যাবে আর তারটা হবে না। শহর, আমার নিজের শহর। আমি কি করে জানব সে কি করবে না করবে? আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। সেক্ষেত্রে সবকিছুই ঘটা সম্ভব।

ভয় পেল সল্ট। এই প্রথম নিজেকে অসহায় লাগল, একটা ভীতিকর অনুভূতি গ্রাস করল ওকে।

দাঁড়াও, শান্ত হও, নিজেকে পরামর্শ দিল ও। কাঁপতে হবে না। আমার মাথায় ওই চিন্তাটা আসা উচিত হয়নি, কারণ খুন বা হত্যা নির্দয়তা। কাউকে খুন করা বা অদৃশ্য করে দেয়ার মনমানসিকতা আমার নেই।

আমি অবশ্যই আমার মতো থাকব, আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাইরে কিছু করতে যাব না, মনে মনে বলল সল্ট।

কিন্তু অপরজন আলাদা হতে পারে। অস্ত্রটা খুঁজে পাওয়া তার জন্যে ভাগ্যের ব্যাপার হতে পারে।

না! কৌতূহলী হয়ে সিন্দুকের ভেতরে সে নাও তাকাতে পারে। আর তাকালেও, অস্ত্র নেয়া নিষেধ, আর ব্যবহার করা তো আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর অস্ত্র পেলে তার ব্যবহার করা মোটেই সততার পরিচয় দেবে না। কাজেই ওটা না নেয়াই উচিত। ওটা শোভন হবে না। আর ওটা নেয়ার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই।

এ চিন্তাটা মাথায় আসতে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল যেন সল্টের বুক থেকে। এবার ওর জোরে জোরে হাসতে ইচ্ছে করছে। ওই রাস্তা দিয়ে ওরা এলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সহজ হবে। শোভনতার পরীক্ষা। নাস্তা খেতে

খেতে ভাবল সল্ট, এ পরীক্ষায় আমরা দু'বার পাশ করেছি। কাজেই আমাদের একটা দাম আছে, শিশুদের মতো পরিতৃপ্তি নিয়ে ভাবল ও।

খেতে খেতে জঙ্গলের দিকে তাকাল সল্ট। জঙ্গলটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। শিশির ভেজা! সূর্য মাত্র উঠতে শুরু করেছে।

আমি কি করে জানব কনসিল্ড ওয়ানরা আমার শোভনতার সংজ্ঞা মেনে নেবেন? ভাবনাটা মাথায় আসতেই দারুণভাবে চমকে উঠল সল্ট। আমি কি করে তাদেরকে জানব?

এদের কি সত্যি অস্তিত্ব বলে কিছু আছে? সর্বজনীন স্বতঃসিদ্ধতা কি সম্ভব? স্বতঃসিদ্ধতার আচরণ প্রাকৃতিক এবং জীবনের পক্ষে যথেষ্ট কি? চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতি কি সত্যি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করতে পারে? নাকি এর অস্তিত্ব শুধু কিছু কৃত্রিম আচার মন্ত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ? এসব কাজ করা হয় স্রেফ ভয়ে?

শোভনীয়তা হয়তো অন্য কোথাও সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। হয়তো বিশেষ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে, নিয়তি থেকে প্রাপ্ত যে কোনো সুযোগ গ্রহণ করে বিজয় অর্জন করার এটা একটা প্রচেষ্টা। শত হলেও একজনের পৃথিবীর নিয়তি ভারসাম্যের মাঝে রয়েছে।

তবে অন্যজনের পৃথিবীর নিয়তি শুধু নয়, শিউরে উঠে ভাবল সল্ট, পাশাপাশি আমারও নিয়তি নির্ভর করছে এর ওপর।

এই প্রথম ওর মনে হল যতটা সহজ এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভেবেছিল প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটবে, অতটা সহজে তার শেষ নাও হতে পারে। এই প্রথম বুঝতে পারল কনসিল্ড ওয়ানরা যেমন সল্টের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর সতর্ক নজর রাখেন, সে অপরজনের থেকে কিন্তু খুব ভালো অবস্থানে নেই। তার নিজস্ব সমাজের চলমান অস্তিত্ব, কিছুক্ষণ আগেও যা মনে হয়েছিল দারুণ রকম বাস্তব, সঠিক এবং অসীম, এখন সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে সল্টের ওপর। ওটা সত্যি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

না! না! না! শান্ত থাক! প্রথম থেকে ব্যাপারটা শুরু করা যাক। আমি যেভাবে চাইব সেভাবে চলব। আমি অন্যভাবে চলতে চাইনা। অস্ত্রটা হাতে নেয়া অসততা হবে, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অসততার পরিচয় দেয়া হবে তাদের প্রতি যারা আমার ওপর নির্ভর করে আছে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী যদি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করে? আর সে যদি তোমার মতো করে না ভাবে?

তবু আমি কারো প্রতি গুলি করতে পারব না। ওই গোড়ামিটা করার দরকার কি!

কনসিল্ড ওয়ানরা ব্যাপারটা কিরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন?

এটা জানা সম্ভব নয়। কেউ কোনোদিন পারবেও না জানতে।

দাঁড়াও। আবার ভাবতে থাক। যেবাবে ভাবা দরকার ভাবো।

এরকম ভাবাভাবি করে আসলে লাভ কি? সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে দ্রুত। আর এজন্যে শান্ত থাকা দরকার। কোনো ভুল করা চলবে না। সিধে হল সল্ট, তার হাত কাঁপছে।

বিষয়গুলো যুক্তি দিয়ে দেখা যাক। অস্ত্র হাতে নাও, বৃদ্ধি করো নিজের শক্তি, আর এ শক্তি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। এতে বিজয়ী হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। আর অস্ত্র তুলে নিলেও তুমি যদি কাপুরুষী স্বভাবের হও, যদি স্বীকার করো ভায়োলেন্স মুক্ত হয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না, তাতেও ধ্বংসের সম্ভাবনাকে কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

কর্কশ সুরে হেসে উঠল সল্ট।

এর মানে দেখা যাচ্ছে তত্ত্ব অনুযায়ী যুক্তিবাদী পছন্দ করা অসম্ভব ব্যাপার। আর আমি কি করব সে সিদ্ধান্ত নিতে যদি ব্যর্থ হই তাহলে মানে দাঁড়ায় আমি আমার লোকের আদর্শিক স্বতঃসিদ্ধতায় মোটেই বিশ্বাস করি না, যার অর্থ হচ্ছে আমাদের সাথে কিছু নেই। কনসিল্ড ওয়ানরা হয়তো ওভাবেই ব্যাপারটা দেখে থাকবেন।

তোমার হাতে সময় নেই। তোমাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। তোমার পক্ষে কেউ নেই। দ্রুত এবং নির্ভুল বিষয় নিয়ে চিন্তা করো।

এর মানে হল ভাবাভাবি বাদ দাও।

তারপর?

আমি সিন্দুকটা দেখতে পেলাম কেন?

কনসিল্ড ওয়ানদের কাছে কৌতূহল কি বুদ্ধিমত্তা বলে বিবেচিত হবে?

আমি ওটা নিয়ে চিন্তা করতে পারি না।

হতে পারে অপরজনের সিন্দুক নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই?

আমি ওটা নিয়েও ভাবতে চাই না, চাই না, চাই না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জানার কোনো উপায় নেই।

তার মানে, পরিস্থিতির সাথে তুমি পাল্লা দিতে পারছ না।

বোকা শিশুদের মতো শুধু ভেবেই চলেছ।

আমার সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। পাগল হয়ে যাবার আগে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

অন্যজন হয়তো আমার মতো ইতস্তত করছে না। তার অস্ত্র প্রস্তুত আছে, সে এ ব্যাপারে আস্থাবান যে ঠিক কাজটিই করবে এবং সম্ভাব্য রাস্তাতেই...

আমি কি করে ভাবি সে আমার চেয়ে নিচু শ্রেণীর? তার মানে হৃদয়ের গভীরে আমি একজন স্কাউড্রেল?

কাপুরুষতা পাপ নয়?

সতর্কতা খুন নয়?

হয়তো এতে আমার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু গোটা শহর!

সল্ট এবার জানে কি ঘটবে এবং কিভাবে। আর ঘটনা ঘটবে হঠাৎ করে। তার শহর হারিয়ে যাবে সে পরাজিত হবার সাথে সাথে।

ইনার ওয়ার্ল্ডে ঝেল-এর ভাগ্যে কি ঘটবে?

ইনার ওয়ার্ল্ড নিয়ে সে কেন এত দুশ্চিন্তা করছে? তুমি কি ধরেই নিয়েছ তুমি হেরে যাচ্ছ? তুমি কি তোমার মনের মধ্যে হারিয়ে গেছ?

হয়তো ব্যাটারি ছাড়াই অস্ত্রটা নিয়ে যাওয়া যায়। তাহলে কারো জীবন বিপন্ন না করেই তাকে ভয় দেখান যায়।

তুমি কাকে বোকা বানাতে চাইছ? তোমাকে নাকি কনসিল্ড ওয়ানকে? তার মানে দাঁড়াবে তুমি খেয়ালী এবং ধর্য্যহীন। সাহস হারিয়ে স্রেফ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকবে।

আমার শত্রু কিভাবে কাজ করবে তা নিয়ে আমার কি আসে যায়? আমার তো পাবার কিছু নেই, আমি চলব নিজের রাস্তায়। আমি কি আমার শত্রুকে বিশ্বাস করব? তাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেব? কিন্তু সে যদি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

ও আমাকে হত্যা করুক। এটা পাপ হবে, আমি জানি। আর এ পাপ তার শহরকে ধ্বংস করবে। তার শহর, আমার নয়। পাপ সব শেষে পাপীকেই ধ্বংস করে। কাজেই ও করুক আমাকে খুন।

নিজের সাথে কথা বলতে বলতে সকাল হয়ে এসেছে টের পায়নি সল্ট। ভোরের বাতাসের মিষ্টি গন্ধে যেন চমক ভাঙে ওর।

হঠাৎ ও বুঝতে পারে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটা টার্গেট হিসেবে এতক্ষণ প্রস্তুত করে রেখেছিল ও।

লম্বা একটা দেয়াল ও গায়ের ওপর আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল, সল্ট এক ছুটে ঘরের দূর প্রান্তে চলে গেল। দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে চারদিকে তাকাতে লাগল।

এখান থেকে সিন্দুকটা অনেক দূরে। এই মুহূর্তে যদি বারান্দার সিঁড়ি ক্যাচ ম্যাচ করে ওঠে এবং সশব্দে খুলে যায় দরজা, ভেতরে ব্লাস্টার হাতে প্রবেশ করে কেউ? তাহলে? আচমকা বুঝতে পারে সল্ট আসলে এতক্ষণ ধরে তার ওপর মানসিক অত্যাচার চালান হয়েছে। মনে মনে প্রশ্ন করে ও নিজেকে— এভাবে একটার পর একটা শহর অদৃশ্য করে দেয়ার উদ্দেশ্য কি? এতে লাভই বা কি? হঠাৎ এ প্রতিযোগিতার প্রতি ঘৃণা ক্ষোভ জন্মে ওর। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় ও জিততে চায় না। হারতেও চায় না। গোল্লায় যাক কনসিল্ড ওয়ানরা। ওদের সাথে সল্টের কি সম্পর্ক। সল্ট কি করে বুঝবে ওদের মনে কি আছে? ও মনে মনে বলে আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। আমার মতো।

কিন্তু আমি কে? আমি কি সৎ কেউ একজন যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে? নাকি আমি লোভনীয় হবার চেষ্টা করছি? আমি কি কাপরুষ? আমি কে তা না জেনে বেঁচে আছি কেন? এ প্রশ্নের জবাবই আমাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো এখনো খুব বেশি দেরী হয়ে যায় নি। হয়তো নিজেকে জানতে চাইছি বলেই। কোনো ভুল হওয়া চলবে না। কিছুতেই না।

দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল সল্ট। যেন জ্বরের ঘোরে দরজার দিকে আচ্ছন্নের মতো পা বাড়াল, ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল কবাট। কটন উল পরা পা রাখল বারান্দার সিঁড়িতে, দাঁড়িয়ে পড়ল। সূর্যের আলোতে ঝলসে গেছে চোখ। পিটপিট করছে।

তার সামনে, জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে সবুজের ঔজ্জ্বল্য আর সূর্যের উষ্ণতায় প্রশান্তি নিয়ে। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে রংধনু রঙা তৃণ প্রান্তরের ওপরে। সব আশ্চর্য শান্ত। কোথাও থেকে ভেসে এল না বন্দুকের গুলির শব্দ।

'বেশ!' চেঁচিয়ে উঠল সল্ট, ওর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

বিশাল ডানা পতপত করতে করতে দুটি বিরাট পাখি একটা তখন গাছের ডাল থেকে উড়ে এল, পাশাপাশি উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল গভীর নীলের মাঝে।

অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ

এ ডে অব র‍্যাথ

সেভের গানসোভস্কি

ঘন ঘাসে ছাওয়া উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এল দুই ঘোড়সওয়ার, পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। সামনে, বনপাল দুই পা ফাঁক করে বসেছে একটা হুকের মতো নাকঅলা রোনের (তামাটে-লাল বর্ণের ঘোড়া) পিঠে। ডোনাল্ড বেটলি সওয়ার হয়েছে চেস্টনাট ঘোটকির ওপর, আসছে পেছন পেছন। ঘোড়াটা হঠাৎ পাথুরে রাস্তায় পা হড়কে গেল, বসে পড়ল হাঁটু ভেঙে। অন্যমনস্ক বেটলি তাল সামলাতে না পেরে স্যাডলের ওপর থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও।

বনপাল দাঁড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষা করছে বেটলির জন্যে।

'ওটার মাথা উঁচু করে রাখুন,' হাঁক দিল সে। 'নইলে ঘোড়াটা সবসময়ই হোঁচট খাবে।'

ঠোঁট কামড়াল বেটলি, কটমট করে তাকাল বনরক্ষকের দিকে।

'ঘোড়ার গুষ্টি মারি। ব্যাটা আমাকে সাবধান করে দিতে পারত,' মনে মনে ভাবল ও। নিজের ওপরও রাগ লাগছে ওর। কারণ ঘোড়াটা ওকে বোকা বানিয়েছে। স্যাডল পরানোর সময় জানোয়ারটা পেট ফুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণে স্ট্র্যাপটা আলগা হয়ে আছে।

লাগাম ধরে এত জোরে টান মারল ও যে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, পিছিয়ে এল।

রাস্তা আবার সমতল হতে শুরু করেছে। একটা মালভূমিতে চলে এসেছে ওরা। দূরে, ফার গাছের অরণ্য নিয়ে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

লম্বা পা ফেলে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে ঘোড়া দুটি। মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে যাচ্ছে দৌড়ের গতি, যেন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। চেস্টনাটটা বন রক্ষকের ঘোড়াকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল, বেটলি এক নজর দেখল তাকে। দাড়ি কামান পরিস্কার মুখ বনরক্ষকের, মলিন, বিষণ্ন একজোড়া চোখ, যেন আঠার মতো আটকে আছে রাস্তার ওপর, যেন সঙ্গীর উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয়।

'আমি আসলে একটা বোকা,' মনে মনে ভাবে বেটলি। 'আর সহজ-সরল। এত সহজ-সরল হয়ে কোনো লাভ নেই। আমি অন্ততঃ পাঁচবার ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। প্রতিবারই জবাবের বদলে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠেছে লোকটা, নয়তো আমাকে পাত্তাই দেয়নি। আমাকে যেন গ্রাহ্যই করছে না ব্যাটা। তার বোধহয় ধারণা যারা কথা বলতে চায় তার মাথা মোটা বাচাল। এদেরকে সম্মান না দেখালেও চলে। এখানে ভদ্রতার ধার ধারে না এরা। সাংবাদিকের মর্যাদাই বোঝে না। দুরো, আমারও বয়ে গেছে ও লোকের সঙ্গে সেধে কথা বলতে...'

আস্তে আস্তে মেজাজ ভালো হয়ে এল বেটলির। বেটলি এমন একজন মানুষ যাকে ভাগ্য সবসময় সহায়তা করে এসেছে। সে মনে করে তার মতো অন্য সবারও জীবনকে উপভোগ করা উচিত। বনরক্ষক খুব কম কথা বলে। তবে এ জন্যে লোকটার ওপর কোনো রাগ নেই বেটলির।

সেই সকাল থেকে আবহাওয়া খারাপ। তবে এখন আস্তে আস্তে পরিস্কার হতে শুরু করেছে আকাশ, কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে। আকাশের গায়ে ধূসর ছালটা তখন ছেঁড়া মেঘে পরিণত হয়েছে। ঘন জমাট বাধা অন্ধকার জঙ্গল এবং যাদের ওপর প্রকাণ্ড ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে।

বেটলি ঘামে ভেজা ঘোড়ার ঘাড়ে চাপড় বসাল। 'কাল রাতে ঘাস খাওয়ার সময় নিশ্চয়ই সামনের পায়ে ব্যথা পেয়েছিস, তাই আজ পা পিছলে পড়েছিস। সে যাক। আমরা বাকি রাস্তাটুকু ঠিকমত পাড়ি দিতে পারব আশা করি।'

লাগাম ছেড়ে দিল বেটলি, চলে এল বনপালের পাশে।

'এই যে মি. মেলার, আপনার জন্ম কি এখানে?'

'না,' মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দিল বনপাল।

'তাহলে কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

'অনেক দূর থেকে।'

'অনেক দিন ধরে আছেন এদিকে?'

'অনেক দিন,' মুখ ঘুরিয়ে মেলার তাকাল সাংবাদিকের দিকে।

'আস্তে কথা বলুন। নইলে ওরা শুনতে পাবে।'

'ওরা কারা?'

'ওটার্করা ছাড়া আর কারা? আমাদের কথা শোনার পরে ওৎ পেতে থাকবে। তারপর লাফিয়ে পড়বে পেছন থেকে। আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে... আর আমরা যে কারণে এখানে এসেছি তখন ওদের হাতে ধরা না পড়লেই হল।'

'এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে নাকি? কাগজে পড়েছি ওরা নাকি মাঝে মাঝে হামলা চালায়।' জবাবে কিছু বলল না বনরক্ষক।

বেটলি কাঁধের ওপর দিয়ে উদাস চোখে তাকাল পেছন দিকে।

'ওরা কি গুলি করতে পারে? অস্ত্র আছে ওদের কাছে? রাইফেল, কিংবা অটোমেটিক মেসিনগান?'

'ওরা খুব কমই গুলি করে। ওদের হাত গুলি করার মতো উপযুক্ত নয়... মানে ওদের থাবা! কোনো ধরনের অস্ত্রই ওরা চালাতে জানে না।'

'থাবা,' শব্দটা পুনরাবৃত্তি করল বেটলি। 'তার মানে আপনি মানুষ বলে মনে করেন না?'

'কারা, আমরা?'

'হ্যাঁ। আপনারা। স্থানীয় অধিবাসীরা।'

থুতু ফেলল বনরক্ষক।

'আমরা ওদের মানুষ বলে মনে করি না। এখানকার কেউই ওদেরকে মানুষ বলে মনে করে না।'

সংক্ষেপে কাটা কাটা গলায় জবাব দিচ্ছে বনরক্ষক। কিন্তু বেটলি তার জিভ সংযত রাখার সিদ্ধান্তের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

'ওদের সঙ্গে কখনো কথা বলেছন? সত্যি নাকি যে ওরা অনর্গল কথা বলতে পারে?'

'বড়রা পারে। তারা, যাদের একসময় এখানে রিসার্চ ল্যাবরেটরি ছিল... ছোটরা তেমন ভালো কথা বলতে পারে না। তবে ওরা আরো বেশি বিপজ্জনক। ওদের মাথার সাইজ সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ।'

হঠাৎ নিজের ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল মেলার, থেমে গেল জন্তুটা। কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠ।

'শুনুন, এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আমি হাজারোবার দিয়েছি।'

'লাভ নেই কেন?'

'এই যে আমরা অভিযান চালাচ্ছি। এতে কোনো লাভ হবে না। সব যেরকম ছিল তেমনই থাকবে।'

'এত নিশ্চিত হন কি করে? আমি খুব বিখ্যাত একটা পত্রিকার লোক। আমরা এই বিষয়টা সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছি স্টেট কমিশনের জন্যে। যদি প্রমাণ করতে পারি ওটার্করা সত্যি খুব বিপজ্জনক, সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এবার সেনাবাহিনী নামান হবে ওদের বিরুদ্ধে।'

'তাতেও কিছু আসবে যাবে না, কিছুই লাভ হবে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বনরক্ষক। 'এখানে আপনিই প্রথম নন। প্রতিবারেই কেউ না কেউ আসে। সবারই আগ্রহ ওটার্কদের প্রতি। কিন্তু ওটার্কদের সাথে যারা থাকে তাদের ব্যাপারে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। সবাই একই প্রশ্ন করে, এ কথা কি সত্যি যে ওরা আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা জানে? যেন এতে অনেক কিছুই এসে যায়। যেন জ্যামিতি জানে আর আপেক্ষিক তত্ত্ব বোঝে বলে তাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না।'

'কিন্তু আমি ওই কাজেই এসেছি,' বাধা দিল বেটলি, 'কমিশনের জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে। তারপর সারা দেশকে জানিয়ে দেয়া হবে...'

'যারা এখানে এসেছিল তারা তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যায়নি?' বলল মেলার। 'এখানে কি ঘটছে তা আপনি বুঝাবেন কি করে? বুঝতে হলে এখানে থাকতে হবে, কয়েকদিনের জন্যে থাকা এক ব্যাপার আর সারাজীবন থাকা আলাদা জিনিস। ...যাকগে, ফালতু বকবক করে লাভ নেই। চলুন, এগোই।' ঘোড়ার পেটে বুট দিয়ে লাথি বসাল মেলার।

'এখান থেকে কোথাও হয়তো ওদেরকে চোখে পড়বে আপনার। এই উপত্যকা থেকে।'

সাংবাদিক আর বনরক্ষক একটা ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে নিচের দিকে।

বেশ খানিকটা দূরে, নিচে শুয়ে আছে ঝোপঝাড়ে আর জঙ্গলে ভরা উপত্যকা, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে সরু, পাথুরে জলধারা। তীরে জঙ্গলের খাড়া দেয়াল, তার পেছনে, অনেক দূরে বরফ ছাওয়া পাহাড়ের চুড়ো।

ঢাল থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে দৃষ্টি চলে, তবে জীবনের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না বেটলির। চিমনির ধোঁয়া নেই, নেই খড়ের গাদা যা দেখে বোঝা যাবে লোকজন থাকে। যেন মৃত একটা জায়গা।

এক টুকরো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য, ঠাণ্ডা লাগছে। সাংবাদিক উপলব্ধি করল বনপালকে নিয়ে নিচের উপত্যকায় যাবার সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে হঠাৎ করেই।

কাঁধে ঝাঁকুনি দিল সে, যেন ঠাণ্ডাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। নিজের উষ্ণ, ফায়ার প্লেসে গরম অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে পড়ছে ·ব, চোখে ভেসে উঠল উজ্জ্বল, গরম সম্পাদকীয় অফিস। তারপরই মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা বাদ দিল। 'কি সব আবোল তাবোল ভাবছি! এরচে'ও খারাপ পরিস্থিতিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। আর ভয় পাবার কি আছে? আমি নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ একজন মানুষ। ওরা আমাকে ছাড়া এখানে আর কাকেই বা পাঠাত?' দেখল মেলার কাঁধ থেকে তার রাইফেল নামাচ্ছে, শুরু করেছে পথ চলা।

সরু রাস্তা ধরে সাবধানে নামতে শুরু করল ঘোড়া।

সমতল ভূমিতে নেমে আসার পরে মেলার বলল, 'আমার পাশে পাশে থাকুন। আর কথা বলবেন না। আটটার মধ্যে স্টেগলিকের ফার্মে পৌঁছুতে হবে। ওখানে রাত কাটাব।'

এরপর টানা দু'ঘন্টা ঘোড়ার লাগাম ধরে চলতে লাগল, কোনো কথা বলল না। ঢাল ধরে চলছে ওরা, মাউন্ট বিয়ারের কিনারা ধরে চলল। হাতের ডানে জঙ্গলের দেয়াল, বামে খাড়া উঁচু গিরিচূড়া। সেখানে অল্প ঝোপঝাড় ছড়ান-ছিটান, কারো পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। নদীর তীরে নেমে এল ওরা, পাথুরে তলদেশ পার হয়ে উঠে এল পরিত্যক্ত, অ্যাসফল্টের রাস্তায়। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মে আছে ঘাস। বদ গন্ধ আসছে রাস্তা থেকে।

রাস্তায় উঠেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল মেলার, কান খাড়া করে শুনছে কি যেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল সে, হাঁটু গেড়ে বসল, কান পাতল রাস্তার ওপর।

'ঝামেলা,' সিধে হল মেলার। 'কেউ ঘোড়ার পিঠে চড়ে পিছু নিয়েছে আমাদের। রাস্তা ছাড়তে হবে।'

ঝটপট ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল বেটলি, দু'জনে মিলে পা বাড়াল একটা পরিখার দিকে।

মিনিট দুই পরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। দ্রুত কাছিয়ে আসছে। মাটির কম্পন থেকে বোঝা যায় দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়েছে ঘোড়সওয়ার।

অলডার গাছের পেছনে লুকিয়েছে ওরা। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল বাদামী রঙের একটা ঘোড়া তীব্র গতিতে ছুটে আসছে, পিঠে হলুদ রাইডিং ব্রিচেস আর স্লিকার পরা এক লোক, অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে। এত কাছে তার মুখটা পরিস্কার দেখতে পেল বেটলি। এ লোককে আগেও দেখেছে সে। গত সন্ধ্যায় শহরের এক বারে কয়েকজন লোক এসেছিল, চওড়া কাঁধ, কটকটে রঙের পোশাক গায়ে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে কথা বলে। ওদের চোখের দিকে নজর আটকে গিয়েছিল বেটলির। সবার চোখ একরকম। অলস, ঢুলুঢুলু আর ভীষণ রকম অশুভ চাউনি। এ ধরনের চোখ শুধু গ্যাংস্টারদের হয়।

ঘোড়সওয়ার ওদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, লাফ মেরে রাস্তায় উঠে এল মেলার।

'অ্যাই!'

ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল ঘোড়সওয়ার, থেমে গেল ঘোড়া।

'এক মিনিট, দাঁড়াও।'

বনপালের দিকে কঠিন চোখে তাকাল সে, অবশেষে চিনতে পারল তাকে। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর লোকটা হাত নাড়ল, ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ, চলতে শুরু করল।

যতক্ষণ দৃষ্টিসীমার ভেতরে রইল একঠায় তার দিকে তাকিয়ে থাকল বনপাল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল, ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ঘুসি মারল নিজের মাথায়।

'এবার আর কোনোই কাজ হবে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল বেটলি। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

'কিছু না... বলছিলাম এখন আর কোনো কাজ হবে না।'

'কেন হবে না?' সাংবাদিক তাকাল বনপালের দিকে। তার চোখে জল দেখে অবাক।

'নর্দমার কীট!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে হিসিয়ে উঠল মেলার। 'সব শালা নর্দমার কীট!'

'শোনো!' আপনি থেকে তুমিতে নেমে এল বেটলি। ধৈর্য্য হারাতে শুরু করেছে। 'এভাবে নার্ভাস হয়ে পড়লে অভিযান চালাবে কি করে?'

'নার্ভাস!' বিস্ফোরিত হল মেলার। 'আমি নার্ভাস? এটাকে আপনি নার্ভাস বলবেন? ওই দেখুন!'

হাত তুলে একটা ফার গাছের ডাল দেখাল সে, লাল রঙের মোচায় ছেয়ে আছে। রাস্তা থেকে ত্রিশ হাত দূরে ঝুলে রয়েছে।

বেটলি বুঝতে পারল না ওর মধ্যে দেখার কি আছে। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হল, পাউডারের মতো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল মুখ, মোচাটা পড়ে গেল নিচের অ্যাসফল্টের রাস্তায়।

'আমি এ জন্যেই নার্ভাস,' বলল মেলার। ঝোপের ধারে চলে গেল ঘোড়া আনতে।

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে, ওরা পৌঁছে গেল ফার্মে।

লম্বা, কালো দেড়ে এক লোক, মাথায় চুল যেন কাকের বাসা, কাঠের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে লক্ষ্য করল বেটলি আর বনপালকে ওরা ঘোড়া বাঁধার সময়। লাল চুলো, মোটাসোটা, অভিব্যক্তিহীন চেহারার এক মহিলা এমন সময় উদয় হল বারান্দায়। তার পিছু পিছু এল তিনটি শিশু। দুটি বছর আস্টেক বয়সের ছেলে, আর তের বছরের এক কিশোরী। মেয়েটা এমন রোগা, যেন কাগজ দিয়ে তৈরি।

ওরা পাঁচজন ভাবলেশহীন চোখে দেখছে বেটলিদেরকে। স্রেফ তাকিয়েই রইল। এমন অনান্তরিক, নীরব অভ্যর্থনা পছন্দ হল না বেটলির।

সাপারের সময় ভাব জমাতে চেস্টা করল সে।

'ওটার্কদের সাথে তোমরা থাক কিভাবে? ওরা কি তোমাদেরকে বেশি বেশি বিরক্ত করে?'

'কি?' কালো দেড়ে চাষী বলল, কানের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে এল টেবিলের ওপর। 'কি বললেন?' চেঁচাল সে। 'জোরে বলুন। আমি কানে ভালো শুনতে পাই না।'

লোকটাকে বেটলি শোনাতেই পারল না সে কি বলছে। বার বার কানে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিত করল সে শুনতে পাচ্ছে না। শেষে দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে চাষী বলল, 'ওটার্করা নিশ্চয়ই এদিকে ঘোরাফেরা করে। ওরা কি তাকে বিরক্ত করে?' না, জবাব দিল চাষী। ব্যক্তিগতভাবে তারা কোনো বিরক্ত করেনি তাকে। তবে অন্যদের কথা বলতে পারবে না সে। আর এ ব্যাপারে কিছু বলারও নেই তার।

আলোচনার মধ্যে কাঠি কাঠি চেহারার মেয়েটা, শাল মুড়িয়ে বসে ছিল, কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ চলে গেল।

খানার প্লেটগুলো খালি হতে চাষী বউ পাশের ঘর থেকে দুটো মাদুর নিয়ে এল, বেটলিদের জন্যে বিছানা পাততে লাগল মেঝেতে। তাকে বাধা দিল মেলার।

'রাতটা আমরা শেডেই কাটিয়ে দিতে পারব।'

কোনো কথা না বলে সিধে হল মহিলা। চাষী দ্রুত উঠে দাঁড়াল টেবিল ছেড়ে।

'কেন? ঘরের মধ্যেই তো ভালো ঘুমাতে পারতেন,' কিন্তু মেলার ইতোমধ্যে মাদুর জোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেছে বাইরে।

চাষী লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। শেডে ঢুকল ওরা। বিছানা তৈরি করছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল চাষী। কি যেন বলতে চাইছে সে। তবে শেষ মুহূর্তে মত বদলাল। মাথা চুলকাল হাত দিয়ে। চলে গেল।

'এসব করছ কেন?' জিজ্ঞেস করল বেটলি। 'ওটার্করা বাড়িতে ঢুকতে পারে ভেবে?'

মাটি থেকে মোটা একটা তক্তা তুলে নিল মেলার, ভারী দরজায় ঠেস দিল। ভালো মতো পরীক্ষা করে দেখল তক্তাটা ছিটকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

'চলুন শুয়ে পড়ি,' বলল সে। 'অনেক কিছুই ঘটতে পারে। ওরা বাড়ির ভেতরেও ঢুকতে পারে।'

মাদুরের ওপর বসল সাংবাদিক, জুতোর ফিতে খুলছে।

'এদিকে সত্যি কোনো ভালুক আছে? ওটার্কদের কথা বলছি না, সত্যিকারের বুনো ভালুকদের কথা বলছি। জঙ্গলে তো বুনো ভালুকের অভাব থাকার কথা নয়।'

'একটিও নেই,' বলল মেলার। 'ওরা প্রথমে যে কাজটি করেছে তা হল ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে দ্বীপে এসে সমস্ত আসল ভালুকদের মেরে ফেলেছে। একই ঘটনা ঘটেছে নেকড়েদের ভাগ্যেও। রেকুন, শেয়ালসহ আরো নানা জানোয়ার থাকার কথা ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ল্যাব থেকে বিষ এনে সমস্ত ছোট প্রাণীদেরকে মেরে ফেলেছে ওরা। রাস্তায় রাস্তায় মরে পড়ে ছিল নেকড়েরা... বিশেষ কোনো কারণে ওরা নেকড়ের মাংস খায় না। কিন্তু ভালুক খেয়ে সাফ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে পরস্পরকেও ওরা খেয়ে ফেলে।'

'পরস্পরকে খেয়ে ফেলে?'

'হ্যাঁ, ওরা তো মানুষ না। ওরা কি করবে না করবে বোঝা মুশকিল।'

'তার মানে ওরা স্রেফ বুনো কোনো প্রাণী?'

'না।' মাথা নাড়ল বনপাল। 'ওদেরকে শুধু বুনো প্রাণী মনে করিনা আমরা। শহরে বসে তর্ক-বিতর্ক করা যায় ওরা মানুষ নাকি জানোয়ার। কিন্তু আমরা জানি ওরা দুটোর একটাও নয়। নতুন কোনো প্রজাতি হবে ওরা। স্রেফ বুনো প্রাণী নয় ওটার্করা—হলে ভালোই হত। তবে মানুষও নয়।'

প্রশ্নটা গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে জেনেও নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারল না বেটলি।

'এ কথা কি সত্যি যে ওরা উচ্চতর গণিত খুব ভালো বুঝতে পারে?'

ঝট করে ওর দিকে ঘুরল বনপাল।

'শুনুন। এসব উচ্চতর গণিত নিয়ে বকবকানি বন্ধ করুন তো! ওটার্করা অঙ্ক ভালো বুঝলে কি আসে যায়? আপনি মানুষ হলে অঙ্ক বুঝলে তবে হত!'

ঘুরে বসল সে, কামড়ে ধরল ঠোঁট।

লোকটার আসলে নার্ভাস ব্রেক ডাউন হতে বেশি দেরী নেই, মনে মনে ভাবল বেটলি। একটুতেই রেগে ওঠে। নার্ভাস ব্রেক ডাউনের লক্ষণ।

বনপাল অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে এল শিগ্‌গ্রী। মেজাজ হারিয়ে এখন বিব্রত বোধ করছে। খানিক বিরক্তির পরে বলল, 'মাফ করবেন, আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে তাকে দেখেছেন?'

'কাকে?'

'ওই যে প্রতিভাবান মানুষটা, ফিডলার।'

'ফিডলার... অবশ্যই দেখেছি। এখানে আসার আগেও তার সঙ্গে কথা বলেছি। কাগজের জন্যে তার স্বাক্ষাৎকার নিয়েছি।'

'ওকে তারা ওয়াক্স পেপার দিয়ে মুড়ে রাখে বোধ হয়! এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিও যাতে গায়ে লাগতে না পারে।'

'আ-হাঁ। ওকে তারা কড়া প্রহরার মধ্যে রাখে।' বেটলির মনে পড়ল সায়েন্স সেন্টারে প্রথম যাবার দিন কিভাবে ওরা তাকে সার্চ করেছিল, পাস পরীক্ষা করে দেখেছে। তারপর বাগানে, ফিডলারের সঙ্গে দেখা করার আগে আরেকবার ওর পাস চেক করেছে ওরা। খুব কাছ থেকে বেটলির ওপর নজর রেখে চলছিল তারা। ফিডলার সত্যি অঙ্কের যাদুকর। দারুণ এক প্রতিভা। তের বছর বয়সে ফিডলার "সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের পরিবর্তন" শিরোনামে বই লিখে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। জিনিয়াসরাই এরকম কাজ করতে পারে।'

'উনি দেখতে কেমন?'

সে দেখতে কেমন?

এ প্রশ্ন শুনে সাংবাদিকের চেহারা কেমন হতবুদ্ধি দেখাল। ফিডলারকে বাগানে দেখেছিল সে সাদা স্যুট পরে হাঁটতে। লোকটার শরীরের গঠন কেমন বেখাপ্পা ধরনের। খুব চওড়া নিতম্ব, সরু কাঁধ, খাটো ঘাড়... সাক্ষাৎকারটা অদ্ভুত লেগেছিল ওর কাছে। মনে হয়েছিল সাক্ষাৎকার নিতে নয়, দিতে এসেছে সে। প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল ফিডলার, তবে তার আচরণে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠছিল। বেটলিকেও প্রশ্ন করছিল সে। তবে ফালতু প্রশ্ন, যেমন বেটলি গাজরের রস পছন্দ করে কিনা... যেন সাধারণ মানুষকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে ফিডলার।

'সে অ্যাভারেজ হাইটের,' বলল বেটলি। 'ছোট ছোট চোখ... কেন তাকে কখনো দেখনি? সে তো এ ল্যাবরেটরিতে আসে, লেকের ধারে।'

'দুবার এসেছিলেন তিনি,' জানাল মেলার, 'তবে গার্ডরা এমনভাবে পাহারা দিয়ে রেখেছিল তাঁকে, তার ধারে কাছে ঘেঁষার জো ছিল না। ওই সময় ওটার্কদের ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, রিচার্ড এবং ক্রেন তাদের সঙ্গে কাজ করত। তারা ক্রেনকে খেয়ে ফেলেছিল। ওটার্করা পালিয়ে যাবার পরে ফিডলার এখানে আর আসেনি... ওটার্কদেরকে নিয়ে উনি এখন কি বলছেন?'

'বলছে ওটা ছিল খুব ইন্টারেস্টিং একটা বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট। তবে ও ব্যাপারটা নিয়ে এখন সে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করেনি। কসমিক রে কি এক গবেষণায় ব্যস্ত ছিল...'

'কিন্তু গোটা ব্যাপার নিয়ে শুরুতেই এত হৈ চৈ হল কেন? কিসের জন্যে?'

'ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করি...' এক মুহূর্ত ভাবল বেটলি। 'দ্যাখো বিজ্ঞানে কোনো কিছু শুরু করার ধরণটাই এরকম: যদি হয় বা হত? আর এ প্রশ্ন থেকেই অসংখ্য আবিষ্কারের জন্ম।'

'যদি হয় বা হতো, কথার মানে কি?'

'উদাহরণ হিসেবে ধরি: যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা জ্যান্ত তার রেখে দিই তাহলে কি হবে? এই "কি হবে"-র প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ইলেকট্রিক মোটরের সৃষ্টি... সংক্ষেপে বলতে গেলে এটিই হল এক্সপেরিমেন্ট বা গবেষণা।'

'এক্সপেরিমেন্ট,' শব্দটা উচ্চারণ করার সময় দাঁতে দাঁত ঘষল মেলার। 'ওরা এক্সপেরিমেন্ট করেছে আর নরখাদকদের ভিড়িয়ে দিয়েছে আমাদের মধ্যে। তারপর আমাদের কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে। ওরা বলে যতক্ষণ শক্তিতে কুলোয় নিজের লড়াই নিজেই লড়ে যাও। ফিডলারের এখন আর ওটার্কদের নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই, নেই আমাদের ব্যাপারেও। ওরা সংখ্যায় শত শত জন্ম নিচ্ছে এবং কেউ জানে না ওদের মনে কি আছে।' এক মুহূর্তের মধ্যে নীরব হয়ে গেল মেলার। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ওরা কি কাণ্ড ঘটিয়েছে যদি একবার চিন্তা করেন, ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে যাবে সরসর করে। একবার ভাবুন জানোয়ারদেরকে মানুষ বানান হচ্ছে আর মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান তৈরি করা হচ্ছে তাদেরকে।'

উঠে দাঁড়াল মেলার, রাইফেলে গুলি ভরল, তারপর মাদুরের পাশে, মাটির ওপর রেখে দিল অস্ত্রটা।

'শুনুন, মি. বেটলি, যদি নরকও ভেঙে পড়ে, মানে কেউ যদি দরজায় বাড়ি দিতে থাকে বা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে, স্রেফ মাদুর আকঁড়ে ধরে থেকে চুপচাপ শুয়ে থাকবেন। নয়তো অন্ধকারে পরস্পরকে আমরা গুলি করে বসতে পারি। চুপচাপ শুয়ে থাকবেন... আমি জানি কি করতে হবে। এ

সবে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরের মতো...ইন্সটিংক্ট থেকে জেগে উঠি।'

পরদিন সকালে কুটির থেকে যখন বেরুল বেটলি, সূর্য তখন মাথার ওপরে, ঝলমল করছে রোদ। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে। ঘাস আর গাছপালাগুলো সূর্য কিরণে এত উজ্জ্বল, রাতের গল্প স্রেফ হরর স্টোরি বলে মনে হল।

কালো দেড়ে মাঠে নেমে পড়েছে। কাজ করছে। নদীর এপার থেকে তার সাদা শার্টটাকে একটা বিন্দুর মতো লাগল। এক মুহূর্তের জন্যে সাংবাদিকের মনে হল সুখ হল এটা—সূর্য ওঠার সাথে ঘুম ভেঙে জাগা, শহর জীবনের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা এখানেও কাউকে স্পর্শ করে না, শুধু কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে যাও আর শস্য রোপন করো।

কিন্তু বনরক্ষক ওকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনল। হাতে রাইফেল নিয়ে কুটিরের বাইরে আবির্ভাব ঘটল তার।

'এদিকে আসুন। একটা জিনিস দেখাব।'

কুটিরের কিনার ঘুরল ওরা, বাড়ির পেছনে কিচেন-গার্ডেন। মেলার এখানে এমন একটা কাণ্ড করে বসল যে অবাক হয়ে গেল বেটলি। সে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ পার হল, আলুর সারির পাশে, একটা গর্তে উবু হয়ে বসল। বেটলিকেও ইশারা করল একই কাজ করতে।

তারপর কিচেন-গার্ডেন ঘিরে চক্কর দিতে লাগল ওরা। মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেল একবার। কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারল না।

থেমে গেল মেলার হঠাৎ।

'দেখুন,' বলল সে।

'কি দেখব?'

'বলেছিলেন আপনি শিকারী। এই যে দেখুন।'

ঘাস জমির ফাঁকে, খোলা একটা জায়গায় একটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল বেটলি। পাঁচ আঙ্গুলের।

'ভালুকের পায়ের ছাপ?' জিজ্ঞেস করল বেটলি।

'ভালুকের পায়ের ছাপ? আগেই বলেছি বহুদিন ধরে এ এলাকা ভালুক শূন্য।'

'তাহলে কি ওটার্কের পায়ের ছাপ?'

মাথা দোলাল বন পাল।

'একদম তাজা,' ফিসফিস করল সাংবাদিক।

'কাল রাতের পায়ের ছাপ,' বলল মেলার। 'লক্ষ করুন জায়গাটা কেমন স্যাঁতসেঁতে। বৃষ্টি শুরু হবার আগে সে বাড়িতে ছিল।'

'বাড়িতে?' শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা ধাতুর যেন স্পর্শ অনুভব করল বেটলি।

'এ বাড়িতে ওটা ছিল বোঝাতে চাইছ?'

জবাব দিল না বনপাল, গর্তের দিকে উঁকি মেরে দেখল একবার, তারপর নিশব্দে ফিরে চলল।

কুটিরে এসে বসল ওরা। বেটলি হাঁপাচ্ছিল। একটু সুস্থির হতে মেলার বলল:

'কাল রাতে খাওয়ার সময় স্টেগলিক কালার অভিনয় করেছে। আসলে জোরে জোরে কথা বলেছে যাতে ওটার্ক শুনতে পায় তার কথা। পাশের ঘরে লুকিয়ে ছিল ওটার্ক।'

কথা বলল সাংবাদিক, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

'এসব কি বলছ তুমি? বলতে চাইছ মানুষ আর ওটার্ক সহবস্থান করছে?'

'গলার স্বর নামান,' বলল বন রক্ষক। 'সহবস্থান মানে কি? স্টেগলিকের কিছু করার ছিল না। ওটার্ক এসেছে এবং আশ্রয় নিয়েছে। প্রায়ই অমনটা করে তারা। ওটার্করা ঘরে আসে, সোজা চলে যায় বেডরুমে, ঘুমিয়ে পড়ে বিছানায়। মাঝে মাঝে মানুষ জন ঘর থেকে বের করে দিয়ে দু'একদিনের জন্যে নিজেরাই থাকে।'

'কিন্তু মানুষ কিছু বলে না? তারা ওদেরকে প্রশ্রয় দেয় কেন? কেন গুলি করে মেরে ফেলে না?'

'জঙ্গলে ওটার্কদের অভাব নেই। একজনকে মেরে কি হবে? চাষীর বাচ্চা আছে, বউ আছে, তার গরু ভেড়া মাঠে যায় ঘাস খেতে, একটা বাড়ি আছে, ওটাকে পুড়িয়ে দেয়া যায়...তবে আসল হল সন্তান...বাচ্চাদের অপহরণ করতে পারে তারা। সব সময় বাচ্চাদের চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া

চাষীদের কাছ থেকে ওরা সমস্ত রাইফেল কেড়ে নিয়ে গেছে। এ কাজটা করেছে অনেক আগে। প্রথম বছরেই।'

'আর লোকেরাও হাল ছেড়ে দিল?'

'তাছাড়া কি করবে? যারা হাল ছাড়তে চায়নি তাদেরকে পরে এজন্যে পস্তাতে হয়েছে...'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সে, চোখ কুঁচকে তাকাল পনেরো হাত দূরের ঔজার ঝোপের দিকে, তারপর ঝট করে রাইফেল নামাল কাঁধ থেকে। কক্‌ করল। বাদামী রঙের বিশাল একটা শরীর উঠে দাঁড়াল ঝোপ ছাড়িয়ে, শয়তানের মতো একজোড়া চোখে স্পষ্ট ভয়, চেঁচিয়ে উঠল:

'এ্যাই, গুলি করো না! গুলি কোরো না!'

মেলারের কাঁধ খামচে ধরল সাংবাদিক। বাজ পড়ার মতো শব্দ হল, গুলিটা লাগল গাছের ডালে। বিশালদেহী লাফিয়ে উঠল, ঝাঁপ দিল জঙ্গল লক্ষ্য করে, অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের আড়ালে। তারপর কয়েক সেকেন্ড গাছপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে সব নীরব।

সাংবাদিকের দিকে রাগ নিয়ে তাকাল মেলার। 'আপনি গুলি করলেন কেন?'

ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেছে সাংবাদিকের, ফিসফিস করে বলল, 'ওটা অবিকল মানুষের গলায় কথা বলল! তোমাকে গুলি করতে নিষেধ করছিল।'

বনরক্ষক এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল বেটলির দিকে, ক্রোধের ছাপ মুছে গিয়ে চেহারায় ফুটে উঠল ক্লান্তি। রাইফেল নামিয়ে রাখল।

'হ্যাঁ... এই প্রথম কোনো অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখলাম ওদের চেহারায়।'

পেছনে খস খস শব্দ হল। দু'জনেই বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল।

চাষী বউ বলল:

'নাস্তা খেতে আসুন। টেবিলে রেডি।'

নাস্তার টেবিলে বসে সবাই এমন ভান করল যেন কিছুই ঘটেনি।

নাস্তা করার পরে চাষী ঘোড়ায় স্যাডল বসাতে ওদেরকে সাহায্য করল। বিদায় পর্বে কেউ কোনো কথা বলল না।

চাষীর খামার ছেড়ে চলে আসার পরে মেলার জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, আপনার প্ল্যানটা কি? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। আপনাকে পাহাড়ি এলাকায় শুধু ঘুরিয়ে দেখানর কথা বলা হয়েছে, এর বেশি কিছু আমি জানি না।'

'ওই আর কি...ওতেই চলবে...এদিকের পাহাড়ে একটু ঘুরে বেড়াব। মানুষজন দেখব... তাদের সঙ্গে কথা বলব। সম্ভব হলে ওটার্কদের সঙ্গে মিলিত হব। এরকমই একটা অনুভূতি হচ্ছে মনে।'

'খামার বাড়িতে বসে এরকম অনুভূতি হয়েছিল?'

শ্রাগ করল বেটলি।

হঠাৎ তার ঘোড়া থামিয়ে ফেলল বনপাল।

'চুপ...'

কান পেতে কি যেন শুনছে ও।

'কেউ দৌড়ে আসছে এদিকে। চাষী বাড়িতে কিছু বোধহয় ঘটেছে।'

ঠিক তখন একটা চিৎকার ভেসে এল:

'মেলার! হেই, মেলার!'

ঘুরে দাঁড়াল ওরা, দৌড়ে আসছে চাষী। বেদম হাঁপাচ্ছে। মেলারের স্যাডল হর্ন আকড়ে ধরল ও, ক্লান্তিতে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

'ওটার্ক টিনাকে ধরে নিয়ে গেছে। মূজ ক্যানিয়নে নিয়ে গেছে।'

মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল সে, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা।

এক টান মেরে চাষীকে তার স্যাডলে তুলে নিল মেলার। তারপর ছুটতে শুরু করল তার ঘোড়া, খুরের আঘাতে ছিটকে পড়তে লাগল মাটি।

এরকম এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এত জোরে ছুটতে পারবে কল্পনাও করেনি বেটলি। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের গুড়ি লাফিয়ে পার হচ্ছে ও, ঝোপঝাড়, খানাখন্দ সব মিলে যাত্রার প্রায় অগম্য করে রেখেছে রাস্তাটাকে। ছুটতে গিয়ে গাছের ডালে বাড়ি লেগে মাথার ক্যাপ কোথায় ছিটকে গেল টেরও পেল না বেটলি।

তার ঘোড়া রোনটার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। চেস্টনাটের ঘাড় ডান হাতে জড়িয়ে রেখেছে বেটলি। ধরেই নিয়েছে এই ভয়ঙ্কর দৌড় প্রতিযোগিতায় মারা যাচ্ছে সে।

জঙ্গল আর বিশাল প্রান্তর পার হয়ে একটা ঢালের দিকে ছুটল ওরা, এগোচ্ছে বড় একটা ক্যানিয়নের দিকে।

ক্যানিয়নে এসে বনপাল নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে, পেছনে চাষী। সরু একটা রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে এগোতে লাগল দেবদারু গাছের ঘন ঝোপের দিকে।

সাংবাদিকও নেমে পড়ল তার বাহন থেকে, ঘোড়ার কাঁধে জিনটা ছুঁড়ে দিয়ে পিছু নিল মেলারের।

প্রথম দিকে বনপালের সাথে তাল মিলিয়ে ছুটতে পারলেও ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে লাগল বেটলি। হৃৎপিণ্ড দমাদম পিটছে পাঁজরের গায়ে...গলা শুকিয়ে কাঠ, রীতিমত জ্বলছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে মেলারের। হাঁটার গতি মন্থর করল ও, একা একাই হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর মানুষের গলা শুনতে পেল।

ক্যানিয়ন যেখানে সরু হয়ে এসেছে, সেখানে একটা বাদাম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেলার, হাতে রাইফেল। গুলি ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত। চাষী দাঁড়িয়ে আছে কাছেই।

ধীরে ধীরে বলল বনপাল:

'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও। নয়তো তোমাকে খুন করব।'

কথাটা বাদাম গাছের ঝোপকে উদ্দেশ্য করে বলা।

জবাবে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল, সেই সাথে মেয়েলি গলার কান্না।

আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করল মেলার।

'ওকে ছেড়ে দাও নইলে তোমাকে খুন করব। আমি মরে গেলেও তোমাকে আগে মেরে তারপর মরব।'

এবার আরো জোরে শোনা গেল গর্জন, তবে মানুষের কণ্ঠ নয়... যেন গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ভেসে এল শব্দগুলো।

'ছেড়ে দিলে আমাকে মারবে না তো?'

'না', বলল মেলার। 'ওকে ছেড়ে দিলে তোমাকে স্পর্শও করব না।'

ঝোপের আড়ালে নীরবতা নেমে এল, শুধু বাচ্চা মেয়েটির ফোঁপানির শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

এরপর শুকনো ডালপালা ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল, ঝোপের আড়ালে সাদা কি যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। রোগা মেয়েটা বেরিয়ে এল। তার এক হাতে রক্ত। অন্য হাত দিয়ে রক্তাক্ত হাতটা ধরে রেখেছে সে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল, তিনজন মানুষের কারো দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকা মেয়েটাকে ওরা তিনজন অনুসরণ করল চোখ দিয়ে।

কালো দেড়ে চাষী তাকাল মেলার এবং বেটলির দিকে। তার বিস্ফারিত চোখের ধারাল চাউনির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ নামিয়ে ফেলল মেলার।

রাতটা ওরা কাটিয়ে দিল জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা কুটিরে। এখান থেকে লেকের পাড়ের দ্বীপ, যেখানে একসময় ল্যাবরেটরিটা ছিল, কয়েক ঘন্টার পথ। কিন্তু মেলার অন্ধকারে যেতে রাজি হল না।

আজ নিয়ে চতুর্থ দিন ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। বেটলির আশার পরিমাণ দিন দিন যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে। আগে ভ্রমণ পথে কোনো সমস্যায় পড়লে সেটাকে পাত্তা দিত না সে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ট্রেনে আরাম করে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়ান আর জঙ্গলে প্রাণ হাতে করে হাঁটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

এ এলাকার লোকজন যেন কেমন। অসামাজিক, অনান্তরিক, কারো মুখে হাসি নেই। এমনকি বাচ্চারাও কখনো হাসে না।

মেলারকে জিজ্ঞেস করেছিল বেটলি চাষীরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কেন। জবাবে মেলার ব্যাখ্যা করেছে এখানকার সমস্ত জমিজমার মালিক তারা বলে মাটি ছেড়ে যেতে চায় না কেউ। কিন্তু কেউ বিক্রি করতে চাইলেও পারে না। ওটার্কদের জন্যে এখানকার জমি কেনার আগ্রহ কারো নেই।

বেটলি তাকে জিজ্ঞেস করেছে:

'তুমি যাচ্ছ না কেন?'

এক মুহূর্ত ভেবেছে বনপাল, তারপর ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলেছে,

'আমি আসলে এখানে যেন আটকা পড়ে গেছি। ওটার্করা আমাকে ভয় পায়। আমার নিজের বলতে কিছু নেই। বাড়িঘরও নেই। কোনো দিক দিয়েই ওরা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। শুধু মারামারি করা ছাড়া। আর সেটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।'

'তার মানে ওরা তোমাকে সম্মান করে।'

মেলার মাথা তুলে তাকিয়েছে। চেহারায় বিস্ময়।

'ওটার্করা?... আরে, না! সম্মান কি জিনিস তাই জানে না ওরা। ওরা মানুষ না। তারা ভয় পায়। ভয় পায় কারণ আমি ওদেরকে হত্যা করতে পারি।'

তবে মনে হচ্ছিল ওটার্করা ঝুঁকিটা নেবে। বনপাল এবং সাংবাদিক দু'জনেরই একইরকম অনুভূতি হচ্ছিল। শিরশিরে একটা বোধ জাগছিল চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে তাদেরকে। তিনবার ওদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। একবার পরিত্যক্ত একটা বাড়ির জানালা দিয়ে, দু'বার সরাসরি জঙ্গল থেকে। প্রতিটি হামলার পরে ভালুকের থাবার চিহ্ন দেখেছে ওরা মাটিতে, চিহ্নগুলো প্রতিদিন বেড়েই চলেছে...

কুটিরে ছোট একটা পাথুরে ফায়ার প্লেস আছে। ওতে আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছে ওরা। রান্না করে খায়। বনপাল মুখে পাইপ গুঁজে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে।

ওদের ঘোড়াগুলোকে রাখা হয়েছে কুটিরের খোলা দরজার সামনে।

সাংবাদিক বনপালের দিকে তাকাল। মানুষটির প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। মেলারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, সারাজীবন কেটেছে বনে বাদাড়ে। মেলার ছাপা অক্ষরের কিছু পড়তে পারেই না বলতে গেলে, তার সঙ্গে দু'মিনিট শিল্পকলা নিয়ে কথা বলাও ঝাক্কি। তবুও বেটলির মনে হয় অশিক্ষিত এই মানুষটিই তার বন্ধু হবার যোগ্য। সবসময় স্বাধীনভাবে চিন্তা করে মেলার, আর যে সব বুদ্ধি দেয় তার যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্যতা থাকে। কথা বলার প্রয়োজন না পড়লে সে চুপ করে থাকে। শুরুতে মেলারকে নার্ভাস আর দুর্বল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারে এই পরিত্যাক্ত জায়গায় বছরের পর বছর থাকলে এমনিতেই মানুষ খিটমিটে হয়ে ওঠে।

গত দু'দিন ধরে অসুস্থ মেলার। সোয়াম্প ফিবার হয়েছে। প্রচণ্ড জ্বরে মুখে লাল দানা দানা বেরিয়েছে।

ফায়ার প্লেসের আগুন প্রায় নিভু নিভু হয়ে আসছে। মেলার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল:

'উনি কি বয়সে তরুণ?'

'কে?'

'ওই বিজ্ঞানী, মানে ফিডলারের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সাংবাদিক। 'টেনেটুনে ত্রিশ হবে। কেন?'

'খারাপ। বয়সে তরুণ হওয়াটা খারাপ।'

'কেন?'

এক মুহূর্ত নীরব রইল মেলার।

'দেখুন, ওরা প্রতিভাবান লোকজন ধরে নিয়ে নির্জন জায়গায় আটকে রাখে। ওদেরকে পুষতে থাকে। বাস্তব জীবন কি জিনিস সে সম্পর্কে কোনো ধারনাই নেই ওদের। তাই মানুষের জন্যে কোনো অনুভূতিও নেই,' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আপনাকে আগে মানুষ হতে হবে...তারপর বিজ্ঞানী হতে পারবেন।'

উঠে দাঁড়াল মেলার।

'ঘুমাতে গেলাম। ঘোড়াগুলোকে পাহারা দিতে হবে। নইলে ওটার্করা মেরে ফেলবে ওদেরকে।' এবার সাংবাদিকের পাহারা দেয়ার পালা।

ছোট একটা খড়ের গাদা থেকে খড় চিবোচ্ছে ঘোড়াগুলো।

কুটিরের দোরগোড়ায় বসে পড়ল বেটলি, বন্দুকটা দু'হাঁটুর মাঝখানে।

অন্ধকারে একটা কম্বল ঝপ করে নেমে এল আকাশ থেকে, দ্রুত ঢেকে দিল সবকিছু। অন্ধকারে ক্রমে চোখ সয়ে আসছে বেটলির। চাঁদ উঠল আকাশে। আকাশ পরিস্কার। ঝিকিমিকি তারা জ্বলছে। মাথার ওপরে কোথাও একজোড়া পাখি পরস্পরকে উদ্দেশ্যে করে ডেকে চলেছে।

উঠে দাঁড়াল বেটলি, চক্কর দিতে শুরু করল কুটির ঘিরে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা নিয়ে কুটিরটা, চারদিকে ঘন জঙ্গল। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। রাইফেল লোড করা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল সাংবাদিক।

গত কয়েকদিনের কথা মনে পড়ছে ওর। আলাপচারিতা, নানা জনের চেহারা, অফিসে ফিরে ওটার্কদের নিয়ে সে যেসব কথা বলবে, তাও মনে মনে ঠিক করে ফেলল বেটলি। কিন্তু এই বিপজ্জনক জায়গা থেকে নিরাপদে সে বাড়ি ফিরতে পারবে তো?

'আমি অবশ্যই বাড়ি ফিরতে পারব,' মনে মনে বলল বেটলি।

'কিন্তু মেলারের কি হবে? অন্যদের...?'

কিন্তু ভাবনাটাতে এত বেশি অস্পষ্টতা যে এটার শেষ নিয়ে আর চিন্তা করতে ইচ্ছা করল না ওর।

কুটিরের ছায়ায় এসে বসল বেটলি, ভাবছে ওটার্কদের নিয়ে। খবরের কাগজের একটা হেডিং মনে পড়ে গেল: 'Reason Without Kindness,' বনপাল যা বলেছে তার সাথে প্রবন্ধটার মিল আছে। ওটার্কদের সেও মানুষ বলে মনে করে না কারণ ওদের মধ্যে 'আবেগ' নেই, কারো জন্যে কোনো অনুভূতি নেই।

বেটলির মনে পড়ল এক চাষী ওকে বলেছিল মেলার একবার নগ্ন একটা ওটার্ককে দেখেছিল, গায়ে পশম নেই বললেই চলে। বনপাল মন্তব্য কয়েকদিন ওটার্কদের চেহারা দিন দিন নাকি মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। এটা কি সম্ভব যে একদিন ওটার্করা পৃথিবী দখল করতে পারবে?

'তবে তা ঘটলেও শিঘ্রী ঘটার সম্ভাবনা নেই,' নিজেকে কথাটা শোনাল বেটলি। 'ততদিনে হয়তো আমি মরে ভূত হয়ে যাব।'

কিন্তু শিশুদের কি হবে? তারা কি ধরনের পৃথিবীতে বাস করবে?

ওটার্ক বা অমানুষ সাইবারনেটিক রোবটরা কি মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান?

হঠাৎ পেছনে কোথাও খুট করে একটা শব্দ হল। ঝট করে পেছন ফিরল বেটলি। কাউকে দেখতে পেল না।

সব কিছু স্বাভাবিক মনে হল।

একটা বাদুর উড়ে গেল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে।

সিধে হল বেটলি। হঠাৎ একটা চিন্তা ঢুকল ওর মাথায়। মেলার কিছু একটা যেন লুকোচ্ছে তার কাছ থেকে। সেই যে ঘোড়সওয়ারটা, পরিত্যক্ত রাস্তা ধরে ঘোড়া নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল তার সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কিছু বলেনি বনরক্ষক।

কুটিরের দেয়ালে হেলান দিয়ে আবার বসে পড়ল ও। দেখতে পেল তার ছেলে এসেছে তার কাছে। জিজ্ঞেস করছে:

'বাবা, সবকিছু কি করে এল? গাছপালা, বাড়িঘর, বাতাস, মানুষজন? এরা সব কিভাবে সৃষ্টি হল?'

পৃথিবীর বিবর্তনবাদ বোঝাতে শুরু করল বেটলি নিজেকে, হঠাৎ যেন ছুরি বসিয়ে দেয়া হয়েছে গায়ে, ঝাঁকি খেয়ে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এল ও।

চাঁদের চিহ্ন নেই, তবে আকাশ যেন আরো বেশি উজ্জ্বল।

ঘোড়াগুলোকে কোথাও দেখতে পেল না বেটলি। না, একটা ঘোড়া আছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে ঝুঁকে আছে তিনটে ধূসর ছায়া। একটা ছায়া টান টান হয়ে দাঁড়াল। বেটলি দেখেই বুঝল ওটা একটা ওটার্ক। প্রকাণ্ড মাথা, হাঁ করে খোলা প্রশস্ত চোয়াল, প্রায় অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে।

কাছে থেকে ভেসে এল ফিসফিসে কণ্ঠ:

'ও ঘুমাচ্ছে।'

'না জেগে গেছে।'

'ওর কাছে যাও।'

'গেলেই গুলি করবে।'

'গুলি করলে আগেই করত। হয় সে ঘুমাচ্ছে নয়তো ভয়ে অসাড় হয়ে আছে। যাও।'

সাংবাদিকের নড়াচড়ার সমস্ত শক্তি সত্যি হারিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে সবকিছু যেন ঘটছে স্বপ্নের মধ্যে। ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাটা এসে গেছে, অথচ সে হাত বা পা কোনোটাই নাড়াতে পারছে না।

ফিসফিসানি চলছেই:

'অন্যজনের কি অবস্থা? সে তো গুলি করবে।'

'সে অসুস্থ। ঘুম থেকে উঠবে না...যাও তো...'

অনেক কষ্টে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বেটলি। কুটিরের কোণায় দেখতে পেল এক ওটার্ককে। ছোট, শুয়োরের মতো দেখতে।

আড়ষ্টতা আর ভয় কাটিয়ে ট্রিগারে চাপ বসাল বেটলি। তারপর দুটো গুলির আওয়াজ হল বাজ পড়ার মতো, দুটোই আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হল।

উঠে দাঁড়াল বেটলি, হাত থেকে পড়ে গেল বন্দুক। কাঁপতে কাঁপতে কুটিরের দিকে ছুটল ও, ভেতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। ঠেঙা লাগিয়ে দিল জায়গা মতো।

মেলার উঠে পড়েছে। হাতে রাইফেল। ওর ঠোঁট নড়ে উঠল। কি জানতে চায় বুঝতে পারল বেটলি। ঘোড়ার কথা জিজ্ঞেস করছে।

মাথা ঝাঁকাল বেটলি।

দরজার বাইরে মচমচ শব্দ হল। বাইরে থেকে কিছু একটা এনে দরজার সাথে ধাক্কা লাগাচ্ছে ওটার্করা।

একটা কণ্ঠ শোনা গেল:

'হেই, মেলার! হেই!'

জানালার ধারে ছুটে গেল বনরক্ষক, রাইফেল বের করে গুলি করার চেষ্টা করল। ঠিক সে মুহূর্তে উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে ঝলসে উঠল একটা কালো থাবা; এক টানে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওর কাছ থেকে।

বাইরে থেকে খিকখিক হাসল কে যেন। পরিতৃপ্তির হাসি।

গ্রামোফোনের খসখসে আওয়াজ ভেসে এল:

'এবার তুমি শেষ, মেলার।'

প্রথম কণ্ঠটাকে ডুবিয়ে দিয়ে অন্যরা চেঁচিয়ে উঠল:

'মেলার, মেলার, কথা বল...'

'হেই, ফরেস্টার, কিছু চালাক চতুর কথা শোনাও আমাদেরকে। তুমি তো মানুষ। তোমার তো চালাক হবার কথা...'

'মেলার, কিছু বল। এবং প্রমাণ করে দেব যে তুমি ভুল বলেছ।'

'কিছু বল, মেলার। আমার নাম ধরেও ডাকতে পার। আমি ফিলিপ।'

চুপ হয়ে রইল বনরক্ষক।

সাংবাদিক দ্বিধা নিয়ে কয়েকবার পা বাড়াল জানালায়। কণ্ঠগুলো খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে, কুটিরের দেয়ালের ঠিক ওপাশ থেকে। বাতাসে জানোয়ারদের গায়ের গন্ধ—রক্ত, গোবর আর কিসের যেন মিশ্রিত গন্ধ।

ফিলিপ বলে পরিচয় দেয়া ওটার্ক জানালার ঠিক নিচে থেকে বলে উঠল:

'তুমি সাংবাদিক নাকি, অ্যাঁ? এই যে...?'

গলা খাঁকারি দিল বেটলি। গলা শুকিয়ে কাঠ।

একই কণ্ঠ বলল: 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

তারপর চুপ হয়ে গেল।

'আমাদেরকে খুন করতে এসেছ?'

আবার এক মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ সবকিছু, তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল কারা যেন।

'অবশ্যই ওরা আমাদেরকে খুন করতে চায়... ওরা আমাদেরকে তৈরি করেছে, আর এখন ওরাই আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে চাইছে...'

ঘোঁত ঘোঁত গর্জন, হৈচৈ, হট্টোগোল সব মিলে নরক গুলজার হয়ে উঠল। বেটলির মনে হল বাইরে ওরা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে।

তারপর ফিলিপ বলে পরিচয় দেয়া কণ্ঠটা আবার ডাকল:

'হেই, ফরেস্টার, তুমি গুলি করছ না কেন? তুমি তো সবসময় গুলি করো। এখন করছ না যে? কিছু বলছও তো না। কিছু বল।'

হঠাৎ কোথাও গুলির শব্দ হল।

চট করে ঘুরে গেল বেটলি।

বনপাল উঠে পড়েছে ফায়ার প্লেসের ওপর, খড়কুটো ভরা কাঠের ছিলকা সরিয়ে ওখান থেকে গুলি করতে শুরু করল।

আবার দুটি গুলি হল। রাইফেলে গুলি ভরল মেলার। গুলি করল। ওটার্করা প্রাণভয়ে দিকবিদিক শূন্য হয়ে ছুটে পালাল।

মেলার লাফ মেরে নেমে এল ফায়ার প্লেস থেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তিনটে ওটার্ক গুলি খেয়েছে।

এদের একজন বয়স খুব কম, গায়ে পশম নেই বললেই চলে। ঘাড়ের কাছে লোম গজাতে শুরু করেছে মাত্র। মেলার ওটাকে চিৎ করে শোয়ালে বেটলি প্রায় বমি করে ফেলতে যাচ্ছিল।

মেলার বলল:

'একটা কথা ভুলে যাবেন না এরা মানুষ নয়? যদিও ওরা কথা বলতে পারে। তারা মানুষ প্রায়। খেয়ে ফেলে পরস্পরকেও।'

চারদিকে চোখ বোলাল সাংবাদিক। ভোর হয়ে আসছে। ফাঁকা উঠোন, জঙ্গল, মৃত ওটার্ক—এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু কেমন অপার্থিব ঠেকল।

এটা কি সত্যি সম্ভব?... সম্ভব যে সে ডোনাল্ড বেটলি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে?...

'এখানে ক্রেনকে খেয়ে ফেলেছিল এক ওটার্ক,' বলল মেলার। 'স্থানীয় একজন বলেছে কথাটা। এখানে সে ঝাড়ুদারের কাজ করত। ঘটনাক্রমে সেই সন্ধ্যায় সে পাশের ঘরে ছিল। শুনেছে সব কিছু...'

সাংবাদিক আর বনরক্ষক দ্বীপে চলে এল, সায়েন্স সেন্টারের মূল বিল্ডিং-এ। মৃত ঘোড়ার গা থেকে স্যাডল খুলে ফেলল ওরা। ওদের কাছে এখন রাইফেল আছে মাত্র একটা। পালিয়ে যাবার সময় বেটলিরটাও নিয়ে গেছে ওটার্করা। দিনের আলো থাকতে থাকতে কাছের কোনো খামার বাড়িতে যাবার ইচ্ছে মেলারের। তারপর ওখান থেকে ঘোড়া জোগাড় করবে। বেটলি আধ ঘণ্টা সময় চাইল ল্যাবরেটরিটা ঘুরে দেখার জন্যে।

'লোকটা সবকিছু শুনেছে,' বলে চলল ফরেস্টার। 'রাত ন'টার সময় ঘটনাটা ঘটে। একটা অদ্ভুত যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিল ক্রেন। কয়েকটা ইলেকট্রিক তার পেঁচিয়ে গিয়েছিল। ওগুলো ঠিক করতে করতে মেঝের ওপর বসা ওটার্কের সঙ্গে কথা বলছি ক্রেন। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা। ওদের সৃষ্ট প্রথম দিকের ওটার্ক ছিল ওটা, সবচে' চতুরগুলোর একটা। বিদেশী ভাষাও জানত ওটার্কটা... আমাদের সেই ঝাড়ুদার পাশের ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে ওদের কথা শুনছিল। তারপর এক মুহূর্তের জন্যে সব নীরব হয়ে যায়। তারপর ভারী কিছু একটা আছড়ে পড়ার শব্দ হয়। হঠাৎ সে শুনতে পায় একটা চিৎকার: "ওহ্, মাই গড...।" চিৎকার করছে ক্রেন। তার ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায় ঝাড়ুদারের। এরপর ভয়ানক জোরে চিৎকার করে ওঠে ক্রেন, চেঁচাতে থাকে "বাঁচাও! বাঁচাও!" বলে। ঝাড়ুদার দরজা খুলে ভেতরে তাকায়। দেখে ক্রেন পড়ে আছে মেঝেতে, তার গা থেকে মাংস খুবলে খাচ্ছে ওটার্কটা। ভয়ে আতঙ্কে এমন জমে যায় ঝাড়ুদার যে আর নড়তেই পারে না। ওটার্কটা তার দিকে ফিরে তাকালে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় সে।

'তারপর কি হল?'

'ওরা আরো দু'জন ল্যাব অ্যাসিসট্যান্টকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পাঁচ/ছ'টা তখনো ছিল গবেষণাগারে। এমন ভাব করছিল যেন কিছুই ঘটেনি। শহর থেকে কমিশন আসার পরে ওরা তাদের সঙ্গে কথা বলে ওটার্কদের নিয়ে যায় শহরে। পরে শুনেছি ট্রেনে বসে ওটার্করা নাকি ওদের আরেকজন লোককে খেয়ে ফেলেছে...

ল্যাবের বড় ঘরটা কেউ স্পর্শ করেনি বোঝাই যায়। লম্বা টেবিলের ওপর অনেকগুলো ডিশ, ধুলোর পাতলা সর পড়েছে, এক্স-রে যন্ত্রগুলোতে মনের সুখে জাল বুনে চলেছে মাকড়সার দল। জানালাগুলো ভাঙা। ভাঙা শার্সির ফাঁক দিয়ে ডাল ঢুকিয়ে দিয়েছে অ্যাকাইশা গাছ।

মূল বিল্ডিংটা ছেড়ে চলে এল ওরা।

রেডিয়েশন ইনস্টেলেশনটা দেখার শখ জাগল বেটলির, আরো পাঁচটা মিনিট চেয়ে নিল সে মেলারের কাছ থেকে।

মূল রাস্তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামর গায়ে ঘাস জন্মেছে, ভরে গেছে লম্বা বাঁশ ঝাড়ে। পচা পাতা আর ড্যাম্প পরা গাছের গন্ধ বাতাসে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মেলার।

'কোনো শব্দ পেয়েছেন?'

'না তো!' জবাব দিল বেটলি।

'আমি ভাবছি ওরা একত্র হয়ে কিভাবে কুটিরে আমাদের ওপর হামলা চালাল,' বলল মেলার। 'এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। সবসময় একা হামলা চালানর অভ্যাস ওদের।'

কান পাতল মেলার।

'এখানেও ওরা আরেকটা চমক দেখাতে পারে। তাড়াতাড়ি এ জায়গা থেকে কেটে পড়াই ভালো।'

গোলাকার, নিচু একটা দালানে চলে এল ওরা। জানালাগুলো সরু, কাঁচ নেই একটার গায়েও। ভারী প্রকাণ্ড দরজাটা সামান্য খোলা। কংক্রিটের মেঝে, দোরগোড়ার কাছটা ভরে আছে ধুলো, পাতা, বিভিন্ন পোকা-মাকড়ের পাখায়।

সাবধানে প্রথম ঘরটিতে ঢুকল ওরা। আরেকটা প্রকাণ্ড দরজার ওপাশে নিচু ছাদের হলঘর দেখা যাচ্ছে।

উঁকি দিল ওরা। একটা কাঠের টেবিলের নিচ থেকে একটা কাঠবেড়ালি বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এল, এক লাফে জানালার গরাদ গলে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরে।

মেলার ওটার প্রস্থান দৃশ্য দেখল এক সেকেন্ড। তারপর আড়ষ্ট হয়ে উঠল ওর শরীর, কিছু একটা শুনতে পেয়েছে, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল রাইফেল।

'এ দিয়ে তেমন কাজ হবে না,' বলল সে। ঝট করে ঘুরল যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে।

ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে অনেক।

বাইরে থেকে খসখস শব্দ ভেসে এল, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল সদর দরজা। ভারী কিছু একটা দরজার গায়ে ঠেস দেয়ার শব্দ শোনা গেল।

এক মুহূর্তের মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মেলার এবং সাংবাদিক, তারপর দৌড়ে গেল জানালার দিকে।

এদিকে এক পলক তাকাল বেটলি, পিছিয়ে এল।

বাইরে মৌমাছির মতো গিজগিজ করছে ওটার্করা। ডজনে ডজনে আসছে ওরা, যেন মাটির তলা থেকে ভোজবাজির মতো আবির্ভূত হচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেচি আর হৈ হল্লায় মনে হচ্ছে নরক ভেঙে পড়েছে—শব্দগুলো না মানুষের মতো না প্রাণীর মতো—গর্জন আর চিৎকারের মিশ্রণে তৈরি অদ্ভুত একটা আওয়াজ।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেলার এবং বেটলি।

কাছেই এক তরুণ ওটার্ক দাঁড়িয়ে ছিল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে। ওটার থাবায় কি যেন ধরে আছে।

'ওর হাতে পাথর,' ফিসফিস করল সাংবাদিক, যা ঘটছে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনো। 'জানালা দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারার মতলব করেছে।' কিন্তু ওটা পাথর নয়।

গোলাকার জিনিসটা ভেসে এল বাতাসে; জানালার গরাদে লাগল, প্রচণ্ড শব্দে, চোখ ধাঁধান আলোক রশ্মি নিয়ে বিস্ফোরিত হল ওটা, বিকট ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশ।

জানালা থেকে চট করে পিছিয়ে এল বনপাল। হতভম্ব ভাব ফুটে আছে চেহারায়।

রাইফেলটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, চট করে চেপে ধরল বুকের কাছটায়।

'শয়তানের বাচ্চা!' হাত তুলে দেখাল সে। রক্ত ঝরছে। 'নর্দমার কীট! অবশেষে ওরা পেয়েছে আমাকে।'

মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে, টলমল পায়ে দু'কদম হাঁটল মেলার, তারপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মাটিতে, মেঝেতে হেলান দিয়ে।

'ওরা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

'না।' আঁতকে উঠল বেটলি। 'না।' থরথর করে কাঁপছে ও।

ঠোঁট কামড়াল মেলার, রক্তশূন্য মুখ তুলে তাকাল বেটলির দিকে। 'দরজা!'

সদর দরজার দিকে ছুটে গেল সাংবাদিক। ভারী কিছু একটা সরান হচ্ছে দরজার ওপর থেকে।

বেটলি দরজা দুটো ছিটকিনিই টেনে দিল ভেতর থেকে। তারপর ফিরে এল মেলারের কাছে।

মেলার দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে, হাত জোড়া বুকের ওপর। জামা ভিজে গেছে লাল রক্তে। ওর ক্ষত ব্যান্ডেজ করতে গেল বেটলি, বাধা দিল মেলার। 'কোনো লাভ হবে না। বাঁচব না আমি।'

'কিন্তু সাহায্য অবশ্যই আসবে!' গুঙিয়ে উঠল বেটলি।

'কোথেকে?'

প্রশ্নটা এমন ভোঁতা এবং অসহায় শোনাল, গা হিম হয়ে গেল বেটলির। এক মুহূর্তের মধ্যে চুপ হয়ে গেল ওরা। তারপর মেলার বলল:

'প্রথম দিন যে ঘোড়সওয়ারকে দেখেছিলাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে ওটার্কদেরকে সাবধান করে দিতে যাচ্ছিল আমাদের আগমন সংবাদ জানিয়ে। ওদের সাথে এক ধরনের যোগাযোগ আছে ওটার্কদের... শহরে দস্যু আর ওটার্কদের সাথে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমার ধারণা মঙ্গলগ্রহ থেকে অক্টোপাস এলেও তাদের সাথে দোস্তী পাতানর লোকের অভাব হবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক,' ফিসফিস করল সাংবাদিক।

সময় বয়ে চলল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। শুধু দ্রুত শারীরিক অবনতি ঘটে চলল মেলারের। তবে রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেছে। বেটলিকে শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি সে। দু'জনে পাশাপাশি বসে আছে পাথুরে মেঝেতে।

ওটার্করা আর জ্বালাতন করেনি ওদেরকে। দরজা ভাঙার চেষ্টা করেনি বা আবার কোনো হ্যান্ড গ্রেনেডও ছুঁড়ে মারেনি। বাইরে হৈ-হল্লা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, আবার উথলে উঠছে।

সূর্য অস্ত যাবার পরে ঠাণ্ডা বাতাস দিতে লাগল প্রকৃতি। মেলার এক গ্লাস পানি খেতে চাইল। নিজের ফ্লাস্ক খুলে পানি দিল সে বনপালকে, মুখ ধুলো।

মেলার বলল:

'ওটার্করা পৃথিবীতে এসেছে হয়তো ভালোই হয়েছে। হয়তো লোকে তখন সংজ্ঞায়িত করতে পারবে মানুষ হতে কেমন লাগে। হয়তো তারা বুঝতে পারবে একটা প্রাণীর পক্ষে শুধু অঙ্ক কষতে পারলেই তাকে মানুষ বলে গন্য করা যায় না। মানুষ হতে হলে আরো অনেক কিছু লাগে। বিজ্ঞানীরা নিজেদের নিয়ে অনেক গর্ব করেন কিন্তু নিজেদের গবেষণার বাইরে কিছু দেখার ক্ষমতা তাদের নেই আর বিজ্ঞানই সবকিছু নয়।'

সে রাতেই মারা গেল মেলার। সাংবাদিক বেঁচে রইল আরো তিনদিন।

প্রথম দিন সে শুধু পালাবার চিন্তা করেছে। হতাশ থেকে আশার আলো দেখেছে, বহুবার জানালা দিয়ে গুলি চালিয়ে ভেবেছে কেউ না কেউ তার গুলির আওয়াজ শুনে তাকে উদ্ধার করতে আসবে।

কিন্তু রাতের বেলা তার সমস্ত আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চেয়েছে মন। যখন এমনটি ঘটেছে, সে হলঘরে হাঁটাহাঁটি করেছে, সূর্যের আলোয় আলোকিত দেয়াল ধরে দেখেছে, স্পর্শ করেছে ধুলো মাখা টেবিল।

ওটার্কদের দেখে মনে হচ্ছিল তার ব্যাপারে ওরা যেন সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সুইমিং পুলের পাশে এখন খুব কম সংখ্যক ওটার্ক আছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মাধ্যে মারামারি শুরু করে দেয়।

এক রাতের বেলা হঠাৎ মেলারের ওপর খুব রাগ হল বেটলির। মনে হল তার সমস্ত দুদর্শার জন্যে এই বনরক্ষক ব্যাটাই দায়ী। রাগের চোটে সে মৃত মেলারের লাশ হিড় হিড় করে টেনে এনে দরজার পাশে রেখে দিল।

এক ঘন্টা পরে সে মেঝের ওপর বসে বার বার বলতে লাগল, 'হা ঈশ্বর, আমার ভাগ্যে এমনটা ঘটল কেন?... কেন ঘটল এমন?'

দ্বিতীয় দিনে ওটার্করা বেশ কয়েকবার হাজির হল জানালার কাছে। ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু জবাব দিল না বেটলি।

এক ওটার্ক বলল:

'এই, সাংবাদিক। বেরিয়ে এস। তোমাকে আমরা মারব না।'

আরেক ওটার্ক এ কথা শুনে খি খি করে হাসল।

আবার মেলারের কথা ভাবতে লাগল বেটলি। তবে রাগ নয়, এবার ওকে হিরো বলে মনে হল তার কাছে। এরকম হিরো দ্বিতীয়টি দেখেনি বেটলি। কারো কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই সে ওটার্কদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং মরেছে বীরের মতো।

তৃতীয় দিন ভুল বকতে শুরু করল সাংবাদিক। মনে হল নিজের অফিসে ফিরে এসেছে সে, স্টেনোগ্রাফারকে ডিকটেশন দিচ্ছে। প্রবন্ধের হেডিং হল: একজন মানুষ কি?

সে জোর গলায় ডিকটেশন দিয়ে চলল:

'এ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটেছে, কেউ কেউ একথা বলতেই পারেন যে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান। একবার কৃত্রিম মস্তিষ্কের কথা ভাবুন যা মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে তীক্ষ্ণধার করে তৈরি করা হয়েছে, আরো বেশি বেশি কাজ করার উদ্দেশ্যে। এ ধরনের মস্তিষ্কঅলা কোনো প্রাণীকে মানুষ বলা যাবে কি? আসলে আমরা কি? আচ্ছা, ওটার্কদের যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি...

এরপর চিন্তা ভাবনাগুলো কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় বেটলির।

তৃতীয় দিন একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। বেটলির মনে হল সে রাইফেল নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, গুলি করার জন্যে প্রস্তুত। আসলে বাস্তবে যা ঘটল তা হল মেঝের ওপর শুয়েই থাকল বেটলি। এতই দুর্বল নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই।

একটা পশুর নাক দেখা গেল ওর সামনে। তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও মস্তিষ্ক হাতাল বেটলি, মনে পড়ল ফিডলার আসলে কিরকম দেখতে। ওটার্কের মতো!

তারপর ওর সমস্ত চিন্তা ভাবনা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে টের পেল ওটার্করা ওর গা থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে, জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে বেটলির মনে হল ওটার্করা এই পরিত্যাক্ত এলাকায় সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কয়েক শ হবে হয়তো। এদেরকে পরাজিত করা সম্ভব। কিন্তু কে করবে... সেরকম মানুষ কোথায়...

বেটলি জানে না, জানার কথাও নয়, তার অন্তর্ধানের কথা গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পরে চাষীরা খুবই হতাশ হল প্রথমে। তারপর সবাই যে যার লুকান জায়গাটা থেকে রাইফেল বের করে আনতে শুরু করল। ওটার্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে!

অনুবাদ: অনীশ দাস অপু
